বিশাখা, তোমার নামে

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

॥ প্রাপ্তিস্থান ॥

এস্, জে, এণ্টারপ্রাইজ

৬৪, কলেজ স্ট্রিট,

কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রকাশক :
শ্রীশ্রীসুদীন পাবলিশার্স
এর পক্ষে :
এস্ সাহা
৬৪, কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ :—৩০শে শ্রাবণ, ১৩৭০, জন্মাষ্টমী

মুদ্রাকর :
হরলাল বর্ধন
বর্ধন প্রেস
৮।৪ এ, কাশী ঘোষ লেন,
কলিকাতা-৭০০০০৬।

সি / এক

ঘরের হাল্কা ও ফিকে হলুদ আলোটা দেখতে দেখতে নীল হয়ে গেল। বেলুনের ঝাঁক ভুলে উঠল নারীদের স্তনের মতো। ছোট্ট নীচু প্ল্যাটফর্মে অর্কেস্ট্রার সুর ও ছন্দ হঠাৎ বদলাল। দেয়ালের একমাত্রিক রাজপুত মিছিল কেঁপে উঠল হঠকারী এক নৈসর্গিক হামলায়। নীল পরামূর্তি তার পাতলা ঠোঁট দুটো ফাঁক করল।···আই প্রমিজ ··ড্রাম গর্জাল গর গর গর গর, এ্যাকর্ডিয়ান ভৌতিক স্বরে প্রতিধ্বনি তুলল —আই প্রমিজ, চেল্লো নাড়ি ছেড়া যন্ত্রণায় ছটফট করে বলল—ও আই প্রমিজ···

আই প্রমিজ হানড্রেড মাইলস ফর ইউ···টুনাইট হানড্রেড মাইলস্ ···ও হানড্রেড মাইলস্! সুপার এক্সপ্লোসিভ! খসখসে কাগুজে কণ্ঠস্বরে বলে ওঠে কোন পার্শ্ববর্তী মাতাল। আগের ঘোড়ার পিঠে লিডার, একহাতে পতাকা, টগবগ করে এগোতে থাকে। হাঁ করে তাকাই। ঘোড়াটা নীল রঙের! আজ রাতে একশো মাইল! প্রতিশ্রুতির আওয়াজ ওঠে খুরে খুরে খট খট খটাখট খট খটাখট···ও হানড্রেড মাইলস্! নীল ঘোড়াটা দুরন্ত ছোটে। টুনাইট হানড্রেড মাইলস! বুক ভেঙে যাওয়া প্রতিশ্রুতি হাহাকার করে সন্ধ্যারাতে নৈসর্গিক হঠকরিতায়। হানড্রেড মাইলস, ও হানড্রেড মাইলস···

আমার এই ঘিলুর মধ্যে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে 'একশো মাইলে'র প্রতিশ্রুত ঝড়টা শরীরকে প্রচণ্ড গতিতে ঝাঁকুনি দেয়। আমি নীল ঘোড়ার সওয়ার হয়ে উঠি।

—এ্যাই বাঞ্চোৎ!

আমার কলার ধরে কে টানে। মুখ ফিরিয়ে দেখি ননীদা। তার পাশে ইকবাল। আমি স্পষ্ট দেখতে পাই, ওরা দু-জনেই দুটো নীল ঘোড়ায় চেপে আছে।—ননীদা! তোমার সোর্ড নেই।···আমি খিক-খিক করে হাসি।

—ক পেগ খেয়েছিস? এরই মধ্যে আউট! শিগশির উঠে আয়।

ওঠার ইচ্ছে ছিল না। মনে হয়, ওরা আমার ঘোড়াটার লাগাম টানতে টানতে বাইরে নিয়ে যাচ্ছে। মারবে নাকি? ফুঠপাতে গিয়ে আমার একটু ভয় হয়। অন্যরকম আলো—স্বাভাবিক যা কিছু আবহাওয়া ও পরিবেশের, তা আমাকে কিছুটা স্বাভাবিক করতে থাকে। জিভ অসম্ভব ভারি ঠেকে। বলি—মারবে নাকি ননীদা? হোয়াই? কি করেছি?

ইকবাল চামড়ার জ্যাকেটে হাত ঢুকিয়ে সিগ্রেট বের করে। তক্ষুণি জ্বেলে একবার তেতো মুখে থুথু ফেলে। এতে আরও ভয় পেয়ে যাই।

—ইকবাল, শুওরের বাচ্চাটাকে ঠেলে তোল্‌ গাড়িতে।...

এরপর দেখলুম, আমি একটা গাড়িতে আছি। গাড়িটা জোরে গড়াচ্ছে শব্দবিহীন। বৃষ্টি হচ্ছে নাকি? কাঁচের ওপরটা ঝাপসা, আলোগুলো নেচে নেচে বেড়াচ্ছে বাইরে। মানুষের মতো কিছু ভৌতিক মূর্তি নাচানাচি করছে। কোথাও লাল নীল আলো। ননীদা ড্রাইভ করছে। হ্যাঁ, ননীদার একটা গ্যারেজ ছিল একসময়, মনে পড়ছে বটে। ননীদা বাপমায়ের খেদানো ছেলে। সিক্সটিসেভেনে যশোর থেকে এসে মিস্ত্রী হয়ে জান বাঁচানোর লড়াই দিয়েছিল। কিন্তু এখন তারতো কোন গাড়ি নেই। গ্যারেজও নেই। ইকবালেরও নেই। এ ব্যাটা এক দপ্তরীর ছেলে। কলেজে রাজনীতি করত। গাড়ি করতে পারে নি। এ গাড়ি কার তাহলে?

কিন্তু গাড়িটা যারই হোক, চলছে। জোরে চলছে। ও হানড্রেড মাইলস টুনাইট! হানড্রেড মাইলস যাবেই যাবে আজ রাতে—প্রতিশ্রুতি! বাঃ! চমৎকার! শোভানাল্লা!

ইকবাল আমার দিকে তাকায়। ঠোঁটে সিগ্রেট আর হাসি। ননীদা সামনে থেকে বলে—শালা চেঁচালে পেট ফাঁসিয়ে দেব। ইকবাল, ওকে সিগ্রেট খেতে দিসনে!

—না।

আমাকে মারতে নিয়ে চলেছে? কেন? আমি তো ওদের কাছে কোন দোষ করি নি। কিচ্ছু ফাঁসিয়ে দিই নি কোথাও—কোনরকম তথ্য···ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলা উচিত, ভাবলুম। কিন্তু গাড়িটার আরও স্পিড বেড়েছে। বাইরে সব হলুদে-লালে-নীলে একাকার। ড্রামটা বাজছেই গর গর গর গর, এ্যাকর্ডিয়ান চেলো সুরটা ধরে থাকছে···ও হানড্রেড মাইলস! নীল ঘোড়াগুলো আবার ভেসে উঠল, একমাত্রিক প্রতিবিম্ব। মারলে মারবে। হাসতে হাসতে মরব। শোভানাল্লা!

—ইকবাল, বাঞ্চোতের ঘাড়ে দুটো রদ্দা দে তো!

ইকবাল হাত তোলে। কিন্তু সস্নেহে কাঁধে রাখে। মুখের কাছে মুখ এনে চাপা গলায় বলে—এ্যাকশনে যাচ্ছি। হুঁশ করে নে।

হুঁশ করব মানে? আমি হুঁশেই আছি। সোজা হয়ে বসি। মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে রুমাল বের করি! মুখ মুছে চোখের পলক ফেলি পটাপট্ কয়েকবার—ও! এ্যাকশন!

—বিপ্লব! ইকবালের দাঁত দেখা যায় আবছা আলোয়। সে হাসছে।

—হুঁ!

—ক পেগ খেয়েছিস?

—মনে নেই। পাঁচ ছটা হবে।

—কী?

—জিন।

—ঠিক আছে হুট্ করে পালাবে। জল খাবি? পিছন থেকে একটা জলের হ্যাভারস্যাক টেনে নেয় সে। ছিপি খুলে দেয়। আমি ঢকঢক করে অনেক কষ্টে জল গিলি। কাপড়-চোপড় ভিজে যায়।

ইকবাল খানিকটা জল নিয়ে আমার ঘাড়ে থাপ্পর মারে। আমি আরামে বলি—আঃ। সামনে থেকে ননীদা বলে—কী?

ইকবাল হাসে।—আঃ কী আরাম! বিপ্লব বর্ণবোধ মুখস্থ করছে

একটা ব্রিজ পেরিয়ে যাচ্ছিল গাড়ি। হেড লাইটের সামনে কয়েকটা লরী দেখতে পাচ্ছিলুম। কোথায় এলুম রে ইকবাল ?

—বি. টি. রোডে।

—কোথায় যাচ্ছি ?

—ননীদা বলবে'খন। তুই রিল্যাক্স কর। নেশা কেটেছে ?

—কতকটা।

—তোর চিকেন সঙ্গে আছে তো ?

—আছে।

—সণ্ট ?

—আছে। এই যে!···জ্যাকেটের পকেটে হাত ভরে দেখে নিই। ওগুলো সেখানেই থাকে—চিকেনটাও। শুতে ঘুমোতে খেতে যেতে—সারাক্ষণ। প্রাণের পাহারা ছাড়া আর কী ? ভেতরে চাপা ভয় নিয়ে বেঁচে আছি। চারদিকে ষড়যন্ত্র, শত্রু, পুলিস, সেনাবাহিনী, সরকার ও রাষ্ট্র। আমার নাম বিপ্লব। ১৯৪২ এর আগস্টে জন্ম। ওই সময় দেশে একটা বিপ্লব হয়েছিল নাকি !

এবার অন্ধকার—মাঝে মাঝে টুকরো আলো, আকাশে উল্কার ঝাঁকের মতো—কখনও ধুমকেতুর মতো। কিন্তু আমার মাথা ঠিক হয়ে গেছে। জানালা খুলেছে এতক্ষণে। শব্দ, নানারকম শব্দ শুনতে পাচ্ছি। ও হানড্রেড মাইলস টুনাইট ? নেচে উঠলুম একেবারে। ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটানিতে সুখী। আঃ !

ইকবাল বলে—জিনের স্বভাব এইই। ঢলানি হুট। করতেই জড়িয়ে লেপ্‌টে ধরে, আবার ছেড়ে দিতে দেরি করে না।

ননীদা ডাকে—বাণ্ডিল।

হুঁ, বিপ্লবের বাণ্ডিল সুতো। রঙীন সুতো। পাকেপাকে খুলে দেশজুড়ে রঙীন কাপড় বোনার সাধ ছিল কি বাবার ? বাবাকে আমি দেখিনি। মাকেও দেখি নি।—বলো চর্কাদা।

চর্কা নাম আমিই দিয়েছি ননীদার। সে চাপা হাসে। তারপর বলে—কদ্দূর যেতে চাস ?

—ও হানড্রেড মাইলস্‌!

—মাত্র ? যাঃ! ইকবাল ?

—থাউজ্যাণ্ড মাইলস!

—ঠিক বলেছিস। এরপর পড়ব হাইওয়ে থার্টি ফোরে। তারপর···

ইকবাল হঠাৎ পিছনে ঘুরে কী দেখে নিয়ে বলে—জিপের আলো মনে হচ্ছে!

ডান দিকের রাস্তায় ঢুকে যায় আমাদের গাড়ি। কী ভীড়, কী ভীড়! ছোট রাস্তা। প্রচুর আলো অন্ধকার, অন্ধকার, আলো অন্ধকার, মাঠ, ঘুরে আবার বড় রাস্তায়। ননীদা বলে—সিগ্রেট জ্বেলে দে ইকবাল। পুলিস না হতেও পারে। ছেড়ে দে।

সিগ্রেট জ্বেলে নিয়ে ইকবাল সিটে আরামে বসে।—কে জানে! তাই মনে হল।

—বাণ্ডিল!

—ইয়েস চর্কাদা!

—আর পাঁচ মাইল গেলে চৌমাথা। জায়গাটার নাম মাদারিতলা। সেখানে একটা পেট্রোল পাম্প আছে। কাছাকাছি কোন বাড়ি নেই। সামনে রাস্তা, এক পাশে খোলামেলা মাঠ, অন্যপাশে জঙ্গল, পিছনে পুকুর। বাড়ি পুকুরের পিছনে। রাত আটটা থেকে নটার মধ্যে গা তোলেন গোপালবাবু।

—নামটাতো বেশ! গোপাল—কী ?

—তাতে তোর কী বাপ্পোৎ? গোপালবাবু, ব্যস্‌! ভারি অমায়িক ভদ্রলোক। পুকুরের পিছনে বাড়ি। পাড়ে একফালি রাস্তা আছে। দুটো লোক বল্লম আর লণ্ঠন হাতে বাড়ীতে পৌঁছে দেয়। পাম্পে গোপালবাবু না থাকলে জানব বরাত মন্দ। তখন···

—তখন ?

—তখন, দেখা যাবে। যদি থাকে, তেল ভরা হবে। তারপর খুচরো ও মেমো আনতে যাব। এবং হিট্।

ওর হিট্ শব্দটা অদ্ভুত। অন্ধকারে ইট পড়ার মতো। ননীদার একদিকের চোয়াল আবছা দেখতে পাই। শক্ত একটা রেখা ফুটেছে। চুপ করে থাকি। এতক্ষণে শীত করছে। দুধারে ফাঁকা মাঠ। আকাশে এত তারা থাকে, টের পাইনি কতকাল। ছেলেবেলায় যাদের বাড়ি থাকতুম, তাদের ওপর আকাশ ছিল মনে পড়ে যায়। চমক খাই তক্ষুণি। ওঃ আকাশ—কত বড় আকাশ! কত নক্ষত্র! তারপর কত বছর কিছু দেখা হয় না—কিংবা নেই। হারিয়ে গেছে। গত সেপ্টেম্বরে কয়েকটি জীবিত লাশ অনেকগুলো মৃত লাশের সঙ্গে আমাকে ভুল করে এক জায়গায় শুইয়ে রেখে এসেছিল। পর পর নানা ভঙ্গীতে শোয়ানো এগারোটি লাশ। এক সংঘর্ষের ফলাফল। সেখানে নাকি মাথার ওপর আকাশ আর নক্ষত্র ছিল। আমি জানতে পারি নি। পরে যখন নার্সিংহোমে গোপনে বেঁচে উঠি এবং জানতে পারি সবটা, মন কেমন করতে থাকে। অতগুলো সত্যিকার মড়ার মধ্যে একটা মিথ্যা মড়া ছিল! তারা আর কিছু জানতেও পারবে না। শুধু আমি সাক্ষী থাকলুম। জানলুম, শেষবার সবাই কোথায় শোবার জায়গা পেয়েছিল।

এই ননীদা লাশের মধ্যে থেকে আমাকে তুলে এনেছিল। পুলিস জানে, বডি ছিল রাতে এগারোটা। সকালে দশটা। এগারো নম্বর কোথায় গেল? কলকাতায় নাকি আশি লক্ষ লোক। এগারো নম্বরকে খুঁজে বের করা কঠিন কি? ছবি নিশ্চয় রেখেছিল ওরা না খুঁজে পারে না।

মাঝে মাঝে এসব কারণেই আচমকা নিজেকে মনে হয় একজন লাশ। লক্ষ লক্ষ জীবিতের মধ্যে সারাক্ষণ লুকিয়ে আত্মপরিচয় গোপন করে বেড়াচ্ছি এক মৃত মনুষ। সব সময় সতর্ক থাকছি, ধূর্ত গোয়েন্দা আমাকে খুঁজে বের করল না তো? আমি নতুন নাম

নিয়েছি অনিন্দ্য গুপ্ত। আমি বিপ্লব—তা শুধু জানে এই ননীদা আর তার স্যাঙাত ইকবাল। মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, ননীদাটা আমাকে বাঁচানোর বড় বেশি দাম আদায় করছে। শুওরের বাচ্চা আমাকে ব্লাকমেল করে চলেছে সমানে। যা খুশি করিয়ে নিচ্ছে।

আমি যে জীবিতদের মধ্যে এক নকল জীবিত—ছদ্মবেশী মড়া, এই গোপন তথ্যের চাবিকাঠি ননীদার হাতে। যে মুহূর্তে সেই তথ্য সে ফাঁস করে দেবে, আমি তক্ষুণি সত্যিকার মড়া হয়ে যাব। আমি জানি, আমি জানি! স্বীকারোক্তি নিতে নিতে কী করা হয় —হয়েছিল অনেকবার, আমি জানি।

তার মানে, যে মুহূর্তে পুলিস পলাতক লাশটা খুঁজে পাবে, ওঃ! সে কী ভয়ঙ্কর হবে! দশটি দাবিদারহীন লাশের একমাত্র সাক্ষী আমি। আমিই জানি কী ঘটেছিল।

দুহাতে মুখ ঢাকলুম। এসব কথা ভাবতে গেলেই এই ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা আমাকে জাপটে ধরে। দম আটকে আসে। এই অত্যদ্ভুত বেঁচে থাকা—এই দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস, সারাক্ষণ ভয়চকিত প্রস্তুতি। পালিয়ে পালিয়ে বেড়ানো এই শালা লাইফ।

—বাপ্পিল! কী হল?

—কিছু না।

—নেশা কেটেছে তো?

—হুঁ।

অথচ এই ননীদাটাই আমার বাঁচার সাহস। এই যে বলল কথাগুলো, আমার বুকের মধ্যেটা আঁচ পেল। নভেম্বরে প্রথম শীত ফাঁকা মাঠে তীব্র হয়ে উঠেছিল। আমি এখন ওম পেলুম। মুখ থেকে হাত সরিয়ে বললুম—এবার সিগ্রেট খেতে পারি কি চর্কাদা?

—ইকবাল! দেখ তো!

—থাক্।

পকেটে হাত পুরে প্যাকেটটা বের করি। ইকবাল লাইটার

জ্বালে। দু'হাত ঘিরে শিখাটা আমার মুখের কাছে আনে। সেই আলোয় তার মুখে হাসি—সহোদর ভাই!

এই আমার আত্মীয় আপাতত এই বজ্জাত পৃথিবীতে। এরা আমাকে নিয়ে যাবে আজ রাতে একশো—না, হাজার—থাউজ্যাণ্ড মাইলস! ও আই প্রমিজ টুনাইট হানড্রেড মাইলস···ফর ইউ বিশাখা!

'বিশাখা'! চমকে উঠেছি তক্ষুণি। শব্দটা আচমকা গানের কলিতে একটা ফাঁক দখল করে নিল। বিশাখা তো কারও নাম। কোন মেয়ের নাম। কিন্তু ভারি বিস্ময়কর এই ঘটনা, এ নামে কাউকেও আমি চিনি না। অথচ টপ করে চলে এল অবলীলাক্রমে, যেভাবে টানটান চমড়ায় ছুরির আলতো টানে রক্ত আসে, ফিনকি দিয়ে ঝরতে ঝরতে লাল করে ফেলে। নামটা আমাকে অন্ধকারে আবীর হয়ে ঢাকল।

কিংবা যেভাবে পরিণতির মতো ডালে ফুল আসে, অন্ধকার রাতেও! প্রতীক্ষা ছিল কি জলসেচনে?

খিকখিক করে হেসে উঠি। বিশাখা! কোন মনে হয় না। জাস্ট এ নেম এবং নামে কিছু যায় আসে না। এই নামের একটা চেহারা সামনের ঝলসানো কাচে আস্তে ফোটাই। বিশাখা অর্ধেক ছায়া অর্ধেক ফোটোগ্রাফি হয়ে বারের সেই মেয়েটির মতো আস্তে আস্তে নাচে। গাড়ির শব্দ অর্কেস্ট্রা হয়ে ওঠে। টুনাইট হানড্রেড মাইলস ফর ইউ বিশাখা! শোভানাল্লা!

—বাণ্ডিল, তোমার নেশা কাটে নি! ইকবালের হাতটা আমার গলা বেড় দেয়।

ননীদা ব্রেক কষে। গাড়ি থামিয়ে বলে—ওকে হিসি করিয়ে আন ইকবাল।

দরজা খুলে ইকবাল টেনে নামাল আমাকে। কনকনে ঠাণ্ডা। ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে দাঁড়িয়ে যাই। ইকবাল বলে—বোতাম খুলতে পারবে?

খিকখিক করে হেসে উঠি। অনেকটা সময় লেগে যায়। পাশে ননীদার লম্বা শরীর। ঠোঁটে জ্বলন্ত সিগ্রেট। দু-পকেটে হাত। ঠ্যাং ফাঁক করে সিনেমার ভিলেনের মতো দাঁড়িয়েছে। মনে পড়ে যায়, সে একদিন বলেছিল—বোনটোন থাকলে তোর সঙ্গে বিয়ে দিতুম। জামাই হিসেবে খুব খাঁটি হতিস তুই।

—চর্কাদা, তোমার না-থাকা বোনের নাম দিলুম বিশাখা।

—এ্যাই বাঞ্চোৎ? এখনও ভুল বকছিস। আর দু-মাইল।

—চর্কাদা, বিশাখা নামে কাউকে চেনো?

—নাঃ! ঝটপট সেরে নে! কতক্ষণ লাগে?

–ইকবাল! তুই চিনিস? বিশাখাকে?

—উঁহু! কে রে?

—জানি না। এমনি মনে হল।

মুখ তুলে আকাশ দেখতে দেখতে আমার মন কেমন করে উঠল। পুরনো দলা-পাকানো কান্নাটা বুকের তলায় ঠেলে উঠল। এই শালা লাইফ। চুরি করে বেঁচে থাকা! সারাক্ষণ পালিয়ে পালিয়ে বেড়ানো। নকল গোঁফ পরে থাকার মতো চড়চড় করে মুখের ওপরটা—খুলে কথা বলতেই কষ্ট হয়—যদি খসে যায়!

দূরে উঁচুতে একটা লাল আলো। প্লেনের শব্দ দেখতে দেখতে বোতাম এঁটে গাড়িতে উঠি। ইকবাল উঠে এসে বলে—ফিট?

—হ্যাঃ!

ননীদা স্টিয়ারিংয়ে বসে বলে—মাদারিতলায় স্টেশন আছে রেলের। গোলমাল হলে সেখানে যাবি। ডাউন ট্রেন ধরে ফিরবি।

—গোলমাল না হলে?

—ইকবাল যা বলেছে। থাউজাণ্ড মাইলস! গাড়িটা এ্যামবাসাডার।

—কোথায় পেলে গো চর্কাদা?

ন্যাকা! যেখানে পাওয়া যায়! রাস্তায়।

—কোন রাস্তায় ?

—স্ট্র্যাণ্ড রোডে।

—নাম্বার প্লেট পাল্টেছ ?

হ্যাঁ! ডব্লিউ এন এ সেভেন নাইন থ্রি এইট।

—চর্কাদা, তোমায় চুমু খাব!

—খাস্।

হ্যাঁ, এই আমার ননীদা। আত্মার আত্মীয়। এত চমকার মানুষ। ওর বিশাল ছাতির মধ্যে যে মহৎ হৃদয়টা আছে, তার সম্মানে হাজার-বার লাশ হতে পারি। শোভানাল্লা···

মনে হল একটা বাঁক পেরুচ্ছি। বাঁয়ে ঘুরতেই ননীদার শিস্ শুনলুম। খুশি। ইকবাল বলে, 'এ্যাকশনের আগের এই খুশি ভাবটা ওকে সাচ্চা প্রেমিকের মতো উজ্জ্বল করে তোলে।' এমাসের গোড়ায় বোম্বে এক্সপ্রেসের এক কামরায় ওইরকম শিস দেওয়া খুশি খুশি উজ্জ্বল মুখে পঁচিশ-তিরিশ জন লোককে একের পর এক ভোজালির খোঁচা মেরে যাচ্ছিল। নিপুণ হাতে মালী যেমন বেড়ার মধ্যে দা চালিয়ে শিল্প রচে। চোট খেয়ে কেউ কাঁদল না পর্যন্ত। আহাউহু করল না। বিস্ময়কর। ট্রেন দাঁড়ালে আমরা নামলুম। তখন আচমকা সে কী চেঁচানি! ননীদার হাতটা যেন ফোয়ারার মুখ থেকে সরে আসতেই সে কী ক্ষ্যাপামি!

আলোয় আলোয় দিন খানিকটা জায়গা। চৌমাথার অন্যসব দিকে আলো কম। বাজার। অল্প-স্বল্প লোক আছে। গোপালবাবুর পাম্প বেখাপ্পা জায়গায়। ফুল এত ভালবাসে লোকটা! গাড়িটা ঢুকছে। এত শীত! কাচঘরে গুপুর গাপুর করছে জনাতিন লোক। প্রিঁ প্রিঁ। প্রিঁ প্রিঁ!

রোগা ঢ্যাঙা একটা খাকি পাৎলুন পরা লোক বেরিয়ে আসে। গায়ে চাদর। আমার কান ভোঁ ভোঁ করে। ননীদা কী বলে নামে। ঘচাং শব্দ দরজা খোলার। বুকের ভিতর ছ্যাঁৎ করে ওঠে। উরু

দুটো ভারি লাগে কয়েক মুহূর্তের জন্য। ইকবাল থুথু ফেলে। ওর অভ্যাস। তারপর বেরোয়। আবার ঘচাং শব্দ। আমি চমকে উঠি। ইকবাল ডাকে—আয়!

ননীদা ঢ্যাঙা লোকটাকে বলে—পনের। ব্যস!

সে নলটা তুলে নিয়ে, পেছনকার ট্রাকের ছিপি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এঁটে, এবং আমাদের দিকে তাকাতে তাকাতে পাম্পে ঘনিষ্ঠ হয়। ননীদা বলে—খুচরো নেই। চলো।

ইকবাল আমার দিকে ইসারা করে চোখে। পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিই। রাস্তার দিকে ঘুরি। চৌমাথার কেন্দ্রে একটা আইল্যাণ্ড। চারদিকে রেলিং। ফুল ফুটে আছে। ওপরে আলো। হয়তো ট্রাফিক পুলিশ থাকে দিনের দিকে। নাকি লোকদেখানো ভড়ং। কত কী লোকদেখানো কারবার আছে! আমাদেরও।

ওখানে কাচঘরে ননীদার জোরালো হাসি।—যা বলেছেন মশায়! একজ্যাক্টলি আমারও তাই মত। আরবদের খোসামুদি করো, আর যাই করো—ও শেয়ালের এক রা।

আমার চোখ রাস্তায়—আমি দু'পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে আছি। পিঠের দিকে উঁচুতে সাদা বাল্ব জ্বলছে। ঘুরে দেখলুম, টিপ করা যাবে নাকি। পাঁচ মিটার দূরত্ব আন্দাজ। সামনে ক্যাকটাসের প্রকাণ্ড টব। একঝাঁক পোকা বসে আছে। সবখানেই পোকা থিকথিক করছে। বুগানভিলিয়ায় একটা ময়লা ন্যাকড়া ঝুলছে। তেল কোম্পানীর বিজ্ঞাপনের বোর্ডে টিকটিকি। এতক্ষণে চোখ যায় কাচঘরের পাশের খানিকটা গ্যারেজ মতো জায়গায়। একটা ট্রাক। তলায় বাল্ব জ্বেলে একটা লোক শুয়ে আছে। ট্রাকের মধ্যে লোক। ফস করে দেশলাই জ্বলল। তারপর জ্বলজ্বলে টুকরো।

...ইজরায়েল ইজ ইজরায়েল! অদ্ভুত দেশ মশাই!...আরে! আরে ও কী! ডা ডা...ফরেন পলিসি না বদলালে মরবে। এমনি করে মরবে। চুপচাপ!...ডা ডা ডা...হ্যাঁঃ! তা আপনি যাই বলুন

গাড়ি চড়া কেউ ছেড়ে দিচ্ছে না। অত ভয়ের কারণ নেই। ব্ল্যাক মানিতে…খি খি খি খি…

ঘুরে দেখি কাজ চলছে। ইকবাল পাশে! হাতে চিকেন চিকচিক করছে। অটোমেটিক। তিনটে কাঠ পুতুলের সঙ্গে কথা বলতে বলতে কাজ করছে। আমার আত্মার আত্মীয়! শালা ননীদাকে আজ জাপটে ধরে চুমু খাব।

গাড়ির দরজা খোলা ছিল। সামনে ও পিছনে। দূরে আলো।

অন্য গাড়ি আসছে। আমি জোরালো শিস্ দিই। আর ইয়ার্কি নয়।

বাজখাঁই চেঁচিয়ে উঠেছে গোপালবাবু।—চোর! চোর! ডাকাত! খুন করলে! ডাকাত! ডাকাত!

তারপর ইকবাল বাঁ হাত পকেট থেকে বের করে পেটো ঝাড়ে। প্রচণ্ড আওয়াজ। আবার একটা। ধোঁয়ায় কাচঘর ঢাকা পড়েছে। পাঁচ মিটার ওপরের বাল্বটা আমি ফাটিয়ে দিই। ননীদা তখন গাড়িতে। ঝাঁজালো গন্ধ বাতাসে। পাম্পে আগুন ধরবে না তো? ধরলে ভালই।

ইকবাল ডাকে—চলে আয়। তারপর দুবার ফায়ার করে। এমনি এমনি। ধোঁয়া আর বারুদের কটু গন্ধ। আমাদের গাড়ি বোঁও করে ঘুরে রাস্তায় পড়ে। সামনে লোকেরা ছায়ার মতো নাচতে থাকে। ইকবাল আবার পরপর দুটো পেটো ঝেড়ে দেয় জানলা গলিয়ে। আওয়াজ। চেঁচামেচি। যে আলো দুটো দেখছিলুম, তা হারিয়ে গিয়েছিল। এখন দেখি সেটি রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে গেছে। তাকে একদমে পেরিয়ে যাই আমরা।

ইকবাল বলে ওঠে—ফোন দেখতে পেলুম না। আছে নাকি?

ননীদার জবাব—নেই। শালা মাদারীতলায় ফোন। খোয়ার দেখেছিস?

আমি বলি—শোভানাল্লা?

—শাট-আপ! দশ কিলোমিটার সাইলেন্স!…

তাহলে সাইলেন্স। নীরবতা। ননীদা জিনিয়াস। মনে মনে ইকবালের সঙ্গে কথাবার্তা চালিয়ে যাই।…ওর বোন থাকলে আমার সঙ্গে বিয়ে দিত। ওর বোন থাকলে আমি নাম দিতুম বিশাখা। বিশাখার খাতিরে আজ রাতে একশো মাইল! ও হানড্রেড মাইলস!…অবিশ্যি একটানা বেশি দূর কখনও আমার যাওয়া হয় নি। কেষ্টনগর থেকে কলকাতা যাওয়া হয়েছে অনেক দফায়—অনেকগুলো ছোট দূরত্ব ডিঙিয়ে। রানাঘাটের ওদিকে আমার এক মাসি নাকি থাকেন। গঙ্গার ধারে পাড়াগাঁ। একবার যাব বলে রানাঘাটে নামলুম। বর্ষার দিন। বিকেলবেলা। বাস দেখি বোঝাই। সেদিন ওটাই শেষ বাস। বাস মানে স্টেশন ওয়াগন। তাতে একশোর বেশি লোক। আষ্টেপিষ্টে লোক। জায়গা পেলুম না। মাসির নাম শ্রীমতী যোগমায়া দেবী। কখনও দেখি নি ওঁকে। পোস্টমাস্টারের বউ নাকি। আমার আজও যাওয়া হয় নি। আমরা রাণাঘাট অব্দি যাবো না?—ননীদা! বলেই চুপ করে গেলুম। সাইলেন্স। মনে পড়ল।

কে জানে কেন, অনেক ব্যর্থতা তো দুঃখের দাগ না কেটেই চলে যায়। কিছুকিছু দাগ রাখে। প্রতিজ্ঞা করিয়ে নেয়—আবার করবি তো? শীতলপুর যাওয়া হয় নি। অথচ মাঝে মাঝে তীব্র হয়ে ওঠে পুরানো প্রতিজ্ঞা। যাবো, যাবোই একদিন। স্টেশন ওয়াগনের বদলে আজও কি সরকার বাহাদুর ও-পথে বাসের ব্যবস্থা করেন নি? তিনটে যোজনা চলে গেল! নয়তো হেঁটেই যাব। হাঁটতে আমি খুব পারি। পা দুটো খুব হাল্কা লাগছে এবার। হেঁটেই চলে যাব বিশাখা, আজ রাতে তোমার খাতিরে একশো মাইল।

কেন যে ঘুম পায়। হাই তুলি। তারপর মাথা ঠেকিয়ে রাখি পিছনে। সহোদর ভাইয়ের মতো ইকবাল প্রহরা। তার চোখ জ্বলছে। ননীদা আমার ড্রাইভার। তার হাতে স্টিয়ারিং। আমার ভয় নেই।

যখন চোখ খুললুম, দেখি একটা উঁচু ফটকের গায়ে হেড-লাইট

পড়েছে। লতাপাতা ফুলের বাহার। কাঠের রেলিং দেওয়া কপাট। টিমটিমে বাল্ব জ্বলছে উপরে। প্রি ঁ প্রি ঁ! প্রি ঁ প্রি ঁ!

আমার গায়ের ওপর কম্বল এল কোত্থেকে? কম্বলটা গুটিয়ে রাখি পাশে। ইকবাল আমার গলা ধরে। কানে ফিসফিস করে বলে—বেফাঁস কিছু বলবিনে। আমরা মুর্শিদাবাদ যাচ্ছি বেড়াতে।

প্রি ঁ প্রি ঁ! প্রি ঁ প্রি ঁ!

ফটকের ওপাশে টর্চের আলো আর ভারি গলার আওয়াজ—কে?

—আমি···আমি ভেণ্টু দাদা।

—ভেণ্টু! তুমি কোত্থেকে হে? এত রাতে···? ফটক খুলে যায়। একজন ধবধবে ফর্সা প্রৌঢ় লোক দাঁড়িয়ে আছেন। পরণে লুঙ্গি, সাদা পাঞ্জাবির ওপর কালো চাদর—তাও ঢ্যাঙা! দানব নাকি? হাতে টর্চ। কে একজন পিছন থেকে দৌড়ে আসে। তারও হাতে টর্চ। মনে হল, চাকরবাকর নেই।

—মুর্শিদাবাদ যাচ্ছিলুম। গাড়িটা কেমন করছিল—তাই···

—তাতে কী! ঠিকই তো করেছ। চলে এস। ফটিক, গ্যারেজ দেখিয়ে দে।

ননীদা হেসে বলে—তোমরা নামো। অবনীদার আজ গেস্ট আমরা।

আমার বুকে হাতুড়ি পড়ে। আজ রাতে আবার? এভাবে? ননীদার গাড়ি লনের ওদিকে ঘুরে যায়। প্রৌঢ় ভদ্রলোক বলেন—আপনারা আসুন ভাই। ও আসছে! আসুন। বড্ড শীত বাইরে। চাঁদু! বসার ঘরটা খুলে দে তো বাবা।

গাড়িবারান্দায় গিয়ে ধাপ কয়েকটা। বড় লোক। ননীদাকে চেনে দেখছি। দরজা খোলে। আলো জ্বলে ওঠে পটাপট্। দারুণ সাজানো ঘর। টাকার কুমীর ব্যাটা। বুকটা আবার কেঁপে ওঠে। উরু ভারি লাগে। আজ রাতে আবার? কেন? আর পারি না,—ভাল লাগে না কিছু।

—বসুন ভাই। চাঁদু, আপাতত কফি। শিগগির যা। বেচারীরা নীল হয়ে গেছে। কল্যাণীর পর তো ধূ ধূ মাঠ, ঠাণ্ডা হাওয়া চাবুক মারে। পরশু ফিরলুম রাত নটায়। বাপস্।

সোফায় দু-জনে বসি। পুতুল হয়ে থাকি। নিষ্পলক চোখ।

—ভেণ্টু আমার দূর সম্পর্কের ভাই, ও ছাড়া এমন রাতবিরেতে আর কে আসবে?

ওঃ! আঃ! আরামে শরীর স্নিগ্ধ হয়ে ওঠে। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখতে দেখতে চোখ পড়ে দরজার দিকে। পর্দা তুলে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দু-চোখে ও কিসের দৃষ্টি? আমার চোখ জ্বলে যায়।

সি / দুই

আমার চোখদুটো অবশ এবং খুব ভয় পেয়ে যাই। মনে হয়, মেয়েটি যেন আমার তলানিটুকুও দেখতে পাচ্ছে। কিছুতেই মাথা থেকে এই ধরাপড়ার অস্বস্তিটা ছাড়াতে পারি না। এতে নেশাটা পুরোপুরি কেটে যায়। অবনীবাবু মোলায়েম গলায় কাকে বলেন—সরু, এখনও শুতে যাস নি? রাত্তির হয়েছে। শো গে যা।

তারপর আমার দিকে ঘুরে বলেন—আমার মেয়ে।

ইকবাল সিরিয়াস ভঙ্গীতে বলে—তাই বুঝি? বাঃ!

বাঃ বলায় ইকবালের ওপর আমার রাগ হয়। শালা নিশ্চয় ওর রূপের প্রশংসা করছে। জ্যাকেটের পকেট থেকে এই রাগের দরুন ভদ্রতাবোধশূন্য হয়ে সিগ্রেট বের করি। অবনীবাবু ব্যস্ত হয়ে বলেন—উঁহু। আমি দিচ্ছি। আপনারা ভাই আমার অনারেবল গেস্ট।

লোকটা ঘুঘু সন্দেহ নেই। এত বেশি ভদ্রতা যে কী. তা আমার

বেশ জানা আছে। দামী সিগ্রেটের প্যাকেট সামনে দেখে হঠাৎ কেমন ঘেন্না হয়। শৌখিনতার প্রতি মাঝে মাঝে আমার খুন চড়ে যায়। গম্ভীর হয়ে বলি—থ্যাংক্স্। আমার ও ব্রাণ্ড চলে না।

ইকবাল খুব যত্ন করে সিগ্রেট নেয়। অবনীবাবু দেশলাই জ্বেলে দেন এবং আমারটা ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করলে বাধা দিই—থ্যাংক্স্। একটু পরে।

ইকবাল বলে—আপনার মেয়েকে কী বলে ডাকলেন যেন দাদা?

—সরু। ওর ঠাকমা, মানে আমার মা সরস্বতী নাম দিয়েছিলেন। তখন থেকে সরু।—বলে অবনীবাবু হো হো করে হাসেন। ফের বলেন—আমরা ওকে বিজয়া নাম দিয়েছি।

এইসময় আবার মেয়েটিকে দেখার জন্য ঘুরি। কিন্তু দেখতে পাইনে। সোজাসুজি অবনীবাবুকে বলে উঠি—আমি ভেবেছিলুম ওর নাম বিশাখা।

ইকবাল তার হাঁটু আমার হাঁটুতে ঠেকিয়ে আমাকে সতর্ক হতে ইসারা করে। অবনীবাবু ফের হো হো করে হাসেন।—বিশাখা! কেন ভাই?

ইকবাল বলে—অনিন্দ্য ওইরকম। ওর কথা ধরবেন না দাদা।

অবনীবাবু ডাকেন—কই ভেল্টু! হল তোমার?

ডাক শুনে মনে হয়, এই লোকটির গলা অনেকদূর পৌঁছয়। ফ্রণ্টে যারা হুকুম জারি করে, তাদের গলা এইরকম জোরালো হয় নিশ্চয়। ওঁর শরীর মাপতে থাকি। সেইসময় ভেতরকার দরজা দিয়ে চাঁদু নামে লোকটা ট্রে নিয়ে ঢোকে। ননীদার শিসের আওয়াজ শুনতে পাই। তারপর সেও ঘরে ঢোকে। তার আঙুলে চাবির রিং ঘোরে। অবনীবাবুর পাশে বসে পড়ে সে। আমাদের দিকে চোখ নামিয়ে বলে—কী? বলেছিলুম না?

চাঁদু ও অবনীবাবু কফিতে দুধ চিনি মেশাতে থাকেন। ননীদা বলে—বউদি কেমন আছেন? মাঝে যে একবার এসেছিলুম, তখন তো দেখলুম ভীষণ রোগা হয়ে গেছেন! ওঁকে কোন স্যানিটোরিয়ামে···

অবনীবাবু কফির পেয়ালা ওর হাতে তুলে দিয়ে বলেন—খাও।

ননীদা বলে যায়—স্যানিটোরিয়ামে না, বরং চাইবাসায় ওঁর দাদার কাছে···তিনি তো বড় ডাক্তার শুনেছি···অবশ্যি আপনারও কাছে থাকা দরকার।

ইকবাল বলে—অসুখটা কী?

আড়চোখে দেখি অবনীবাবু অনেকটা বদলে গেছেন। মুখটা গম্ভীর।—চাঁদু, ঠাকুরমশাইকে বলেছিস?

চাঁদু মাথা দোলায়। ননাদা ব্যস্ত হয়ে বলে—না, না। রাত্তিরে আর ও ঝামেলা থাক্, অবনীদা। আমরা খেয়েই বেরিয়েছিলুম।

স্রেফ মিথ্যে কথা। খিদেয় আমার নাড়িভুঁড়ি দাউদাউ জ্বলছে। রাগ হয় ননীদার ওপর। ইকবালের দিকে তাকাই। সে কাঁচুমাচু হাসছে। কিন্তু তারও আমার মতো খিদে পেয়েছে, টের পাই।

চাঁদু বলে ওঠে—তা কি হয় বাবু? এতক্ষণ ভাত ফুটছে। আর দশ মিনিট মাত্র। আজ মাছ ধরানো হয়েছিল একগাদা। অত খাবে কে? ভেজেভুজে ফিরিজে রেখেছিল ঠাকুরমশাই। আপনাদের জন্যেই রেখেছিল!

সে দাঁত বের করে থাকে। অবনীবাবুর মুখের গাম্ভীর্য সরে নি। হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলেন—ভেল্টু, আমি একবার ওপরে যাই। পাশের ঘরে তোমাদের শোবার ব্যবস্থা করে দেবে। চাঁদু, গণেশকে বলেছিস তো?

চাঁদু ঘাড় নাড়ে। অবনীবাবু চলে যান। আমরা ততক্ষণ

কফি খাই, চুপচাপ থাকি। চাঁদুও কথা বলে না। আমাদের খাওয়াটা দেখতে থাকে। শেষ হলে সে পেয়ালাগুলি গুছিয়ে নিয়ে চলে যায়। তখন আমরা তিনজনে আবার একলা হই।

ইকবাল চাপা গলায় বলে—সত্যি, থাকতে হবে নাকি?

ননীদা ভুরু কুঁচকে সিগ্রেট টানতে টানতে জবাব দেয়—নিশ্চয়।

আমি একটু হেসে বলি—এই ভদ্রলোক তোমার কেমন দাদা, চর্কাদা?

ননীদা বলেন—ওঁর সামনে চর্কা-টর্কা বলে বসিসনে! তোকেও আমি কিন্তু বাণ্ডিল বলব না। ইকবাল, কথাটা মনে রাখিস। দিস ইজ ইমপরট্যান্ট।

ইকবাল বলে—তোমার দাদাটি বেশ মালদার মানুষ।

ননীদার চোখ ঘুরে যায় ওর দিকে। —খবরদার বাঞ্চোৎ!

—নাঃ! এমনি বলছি।

ননীদা পা দুটো ছড়িয়ে হেলান দিয়ে মুখটা তোলে এবং চোখ বুঁজে বলে—অবনীদার এই বাড়ির পূবে একটা পারিবারিক মন্দির আছে। সেই মন্দিরের গুপ্ত ঘরে রাধাকৃষ্ণ আছে। শ্রীচৈতন্যদেবের আমলের তৈরী। সোনার বডি। মুকুটে একটা বড় হীরে আছে। গলার হারে বারোটা মুক্তো আছে। লাখ পাঁচেক দাম হবে। মন্দিরের দরজা বছরে একবার খোলা হয়। শ্রাবণে ঝুলন পূর্ণিমার রাতে। ফ্যামিলির বাইরের কাউকেও ঢুকতে দেওয়া হয় না। শুধু আমি একবার ঢুকতে পেরেছিলুম। বউদি—মানে অবনীদার স্ত্রীকে পটিয়ে। বউদি চাবি চুরি করেছিলেন। অবনীদা অবশ্য আজও জানেন না ব্যাপারটা। আর কেউই জানে না।…

আমরা শুনছি আর ঘামছি। শীতটা দূরে সরে গেছে। চাপা শ্বাসপ্রশ্বাস পড়ছে। ইকবাল অস্ফুটভাবে বলে ওঠে—বুঝেছি।

হঠাৎ ননীদা চাপা গর্জায়—কি বুঝেছিস?

আমি বলি—মালটা হাফিজ হবে।

—না।

ননীদা পা দুটো গুটিয়ে সাজা হয়ে বসে। ইকবাল গতিক বুঝে হাল ছেড়ে দেয়—থাক্ ওকথা।

আমি বলি—থাকবে কেন? শুনি। বলো ননীদা।

ননীদা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমাকে আধমিনিট দেখে নেওয়ার পর আবার পা ছড়িয়ে হেলান দেয় এবং বলে—ঘরটা আছে মেঝের তলায়। ওপরেও বিগ্রহ আছে। এইরকম মূর্তি। কিন্তু নকল। সিংহাসনের তলায় পাটাতন আছে সেটা সরালে সিঁড়ি। তারপর নেমে যেতে হবে। সামান্য কয়েকটা ধাপ মাত্র। তলার ঘরটার ছাদ খুব নীচু। বিষাক্ত গ্যাস জমে থাকতে পারে।

আমাদের সাবধান করতেই এটার উল্লেখ। মনে মনে হাসলুম। ইকবাল বলে—ছেড়ে দাও ওকথা। দ্য কিং হ্যাজ হিজ ডায়মণ্ড্‌স্। তাতে কার কী? তোমার বউদির কি অসুখ?

—মাথার অসুখ। মানে—আধপাগলী বলতে পারিস।

—কেন?

ননীদা খুক খুক করে হাসে।—নাও! ওকে বোঝাও কেন মানুষের মাথা খারাপ হয়!

আমি বলি—ভীষণ দুঃখ টুঃখ পেলে হয়।

ইকবাল বলে—সবার হয় না। তোর হয়নি।

ভীষণ চমকে উঠি। ননীদা বলে—ইকবাল, বাণ্ডিল ঠিক বলেছে। বউদির বরাতটা ছাখ। ছেলে হলে বাঁচে না। মেয়ে বাঁচে। মানে—পর পর চারটে ছেলে হয়েই আঁতুড়ে মারা গেছে। ফিফ্‌থ্‌ ইস্যু মেয়ে। এখন বছর উনিশ বয়েস। দিব্যি বেঁচে আছে। মেয়ের পরও বার দুই ছেলে হয়েছিল। যথারীতি মারা গেছে। তার মানে, হিসেব কর্—ছটা ছেলের মৃত্যুর শোক বউদিকে পেতে হয়েছে। এসবের ফলে ওঁর মাথায় ঢুকে গেছে, অবনীদারই কোন

গোপন পাপের ফলে এসব হচ্ছে। কারণ, ছেলে হলে নাকি বুঝতে হবে তাতে পুরুষেরই সবটা এবং মেয়ে হলে স্ত্রীলোকের। অতএব বউদির চমৎকার ক্যালকুলেশন। তাই না?

ইকবাল শুধু বলে—বড্ড অদ্ভুত!

আমি বলি—অদ্ভুত এ কারণে যে, এদেশে ছেলের বদলে মেয়ে হলেই লোকের কষ্ট হয়। স্ত্রীলোকেরাও অবিকল তাই! মেয়ে হয়ে মেয়ের জন্মে খুশি নয়।

ননীদা বলে—সামাজিক সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাতে এ বাড়ি আমরা আসিনি। অন্য গল্প করা যাক্।

ইকবাল হঠাৎ ফিসফিস করে বলে—মালকড়ি যন্তর মন্তর কি গাড়িতে রেখেছ?

ননীদা জোরে হাসতে থাকে। ইকবাল হকচকিয়ে যায়। হাসির পর ননীদা বলে—এ শালা আগের জন্মে নিতান্ত শেয়াল টেয়াল ছিল। নানাদিকে মন চনমন করে বেড়ায়। ওসব ভুলে যা। হুঁ—ফরগেট নাম্বার ওয়ান: মন্দিরের রাধাকৃষ্ণ। ফরগেট নাম্বার টু: আমরা মাদারিপুর পাম্পে কী করেছি। মনে রাখ্, এখন আমরা জেণ্টলমেন। অনারেবল অবনীদার অনারেবল গেস্ট!······

ননীদা আবার শিস দিতে শুরু করে। ঘরে অন্যরকম আবহাওয়া আসে। আমি আস্তে আস্তে হাত পা ছড়িয়ে দিয়ে আরামে চোখ বুজি। তারপর টের পাই, চোখের ভেতর রঙীন অন্ধকারে একটা দরজা দেখতে পাচ্ছি। তার পর্দা তুলে বিশাখা দাঁড়িয়ে আছে।

অমনি সেই 'হানড্রেড মাইলসের' ভুলে যাওয়া সঙ্গীত বেজে ওঠে। আচ্ছন্নের মতো পড়ে থাকি। আমাকে খুন ক'রে শিকারী বাঘের মতো ওই সঙ্গীত সামনের ঠ্যাং টানটান এবং পিছনের ঠ্যাং ভাঁজকরা অবস্থায় বসে থাকে লাশের ওপর। বিশাখা দেখতে থাকে,

হুচোখে বিস্ময় নিয়ে। আমার খুব কষ্ট হয়। মন নরম হাতে থাকে মনে মনে বলি—আমার উঠে যাবার উপায় নেই, দেখছো তো বিশাখা? লক্ষী মেয়ে, আমায় ক্ষমা করো।···

ঘরটা অতিথিদের জন্য। বেশ বড়ো ঘর। হুপাশে হুটো খাট আছে। জোড়া দিলে তিনজন শোয়া যেত। আমি বাধা দিয়েছি। আমি একটু তফাতে নীচে মেঝেয় শুয়েছি। কোন আপত্তি শুনিনি। আজ রাতে আমি কেমন হয়ে যাচ্ছি যেন। একলা শুয়ে কত কী ভাবতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু কী ভাবব? মাথার ভিতর ড্রাম ও চেলোর তুমুল চেঁচামেচি। হানড্রেড মাইলস ছুটে চলার আদেশ।

কম্বল থেকে মুখ বের করে মাঝে মাঝে ননীদা আর ইকবালের নাকডাকা বা শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ শুনছি এবং প্রতিবারই মনে হচ্ছে, এভাবে শুয়ে থাকাটা ঠিক হচ্ছে না। একটা কিছু করা দরকার ছিল—আমার গায়ে একশো মাইল চলার গতি! যেন স্টার্ট দেওয়া গাড়ির মতো চাপা গর্জন আর থরথর কাঁপুনি চলছে। ঠোঁট কামড়ে এই ভাবটা সহ্য করতে চেষ্টা করছি—পারছি না। শুধু একটা তাগিদ দাঁতাল হাতির মাথায় অঙ্কুশ পড়ার মতো বারবার নেমে আসছে······

আর চুপ করে থাকা যায় না। সাবধানে উঠে পড়ি। জানালাগুলো বন্ধ থাকায় ঘরটা খুবই অন্ধকার। পা বাড়াই। কোনদিকে দরজা পাব, জানি না। হাতড়াতে-হাতড়াতে গিয়ে দেয়াল পাই। দেয়াল ধরে এগিয়ে দরজা পাই। খুলি। হাওয়াটা তেমন কিছু ঠাণ্ডা নয়। কিন্তু আকাশ বা আলো দেখতে পাইনে। তাহলে কি বাড়ির ভেতর দিকের দরজাটাই খুলেছি? একটু দ্বিধা হয়। সেটা কেটে যেতে দেরি হয় না। একটা কিছু করতেই হবে। একশো মাইল যাওয়াটা বন্ধ করা অসম্ভব আজ রাতে।

পা বাড়িয়ে মনে হয় সিঁড়ি। কিছু না ভেবে সিঁড়ির ধাপে পা তুলে দিই। ওপরে কোথায় একটা কম আলোর বাল্ব জলছে—

নীচে পৌঁছয়নি। আলো লক্ষ্য করে উঠতে থাকি। তারপর বাঁক ঘুরেই আলোর মধ্যে পড়ে যাই। তক্ষুণি মনে হয়, এটা স্বপ্নে ঘটছে। স্বপ্ন ধরে নিয়েই দ্বিধা কাটাই এবং উঠে যেতে থাকি। তারপর একটা চওড়া বারান্দা পেয়ে যাই। বারান্দায় নীল আলো। স্বপ্ন ছাড়া কিছু নয় ভেবে সাহসে এগোতে থাকি। স্বপ্নে সবকিছু করা যায়। তখুনি এও মনে হয়, স্বপ্নে সব কিছু করা যায়ও না। আমি কি এখন ঘুমন্ত বিশাখার মাথার কাছে বসে কপালে হাত রাখতে পারব? তাকে কি বলতে পারব—সব পাপ পিছনে ফেলে রেখে তোমার জন্যেই চলে এসেছি, বিশাখা!

এসব আবেগময় কথা ভাববার সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে যায় বাঁ পাশে। হকচকিয়ে উঠি। পর্দা ওঠার আগেই স্লিপ করা যায় হয়তো—কিন্তু পর্দা ওঠে এবং ফ্যাকাশে একটা মুখ বেরিয়ে থাকে। হেসে বলি—আমি।

—কে তুমি?

—আমি বিপ্লব···সরি, আমি অনিন্দ্য!

—এখানে কী করছ এত রাত্তিরে?

—ঘুরতে বেরিয়েছি। ঘুম আসছে না।

মুখে ভূতুড়ে হাসি ফোটে।—উঁহু, তোমার মতলব আমি জানি। গলা শুকিয়ে যায়। ফিসফিস করে বলি—কী মতলব?

—তুমি মন্দিরের চাবি চুরি করতে এসেছ!

—না, না! আমি বিশাখাকে···

—চলো। তোমাকে মন্দিরে নিয়ে যাই।

না! আমি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠি। কাঁদতে কাঁদতে বলি—বিশাখার কাছে এসেছি। আমি ওসব কিছু চাইনে!

—তুমি দশ লাখ টাকা দামের মূর্তি দুটো নেবে, না বিশাখাকে নেবে?

—বিশাখা!

—মিথ্যে বলছ !

জোরে কাঁদতে থাকি। চোখ থেকে জলপ্রপাতের মত জলের ধারা ঝরে। চিৎকার করে বলি—না, না, না।···

ননীদার ডাকে ঘুম ভেঙে যায়। হ্যাঁ, স্বপ্ন—তা গোড়াতেই টের পেয়েছিলুম। অথচ স্বপ্নটা একটুও টোল খেল না। ননীদা বলে —পাশ ফিরে শো। চিত হয়ে ঘুমোতে নেই।

পাশ ফিরে শুই। মনটা গলে আছে। আমার এই একটা অদ্ভুত ব্যাপার—স্বপ্ন দেখলে ঠিকই টের পাই যে স্বপ্নই দেখছি, অথচ জাগার চেষ্টা করিনে।

কিন্তু কাকে দেখছিলুম ? অবনীবাবুর স্ত্রীকেই বটে। তাহলে কি আমি আশা করে বসে আছি যে ননীদার মতো আমাকেও সে গুপ্তমন্দিরে নিয়ে যাবে বিগ্রহ দেখাতে ?

এবার হাসি পেল। যদি সত্যি ব্যাপারটা ঘটত, আমি বিশাখাকে চাইতুম না। দশ লাখ টাকা পাওয়া অনেক আরামের ব্যাপার। পেলে কী কী করব, ভাবতে থাকি।

হুঁ—অরণ্য বা পাহাড় বা সমুদ্রের ধারে একটা চমৎকার বাংলো করব। ছিপ দিয়ে মাছ ধরব। একটা গাড়ি থাকবে। মাঝে মাঝে শহরে যাব এটা-ওটা কিনতে। ছবি দেখতে। সুন্দরীদের কাউকে নিয়ে আসব। বউটউ থাকবে না। সেলারে থাকবে উৎকৃষ্ট সব মদের বোতল। আর একটা পিয়ানো—স্বর্গের মতো বিশাল। ভাড়াকরা সুন্দরীকে নাচাব। শোভানাল্লা !

ইকবাল বলে ওঠে—এ্যাই বাঞ্চোৎ। ঘুমো।

জবাব দিইনে। নিজের সাধটার দিকে তাকিয়ে থাকি। কত গতানুগতিক—কত বাজে মাল ! মন ছটফট করে। আঃ! আজ রাতে একশো মাইল যাওয়া হল না।

কতক্ষণ পরে আবার সিঁড়িতে উঠেছি। এবার ওপরকার বারান্দাটা অন্ধকার। দরজা হাতড়াই। একটা দরজায় চাপ দিতেই

খুলে যায়। সাবধানে ভেতরে ঢুকি। পকেট থেকে রিভলবারটা বের করি। টেবিল ল্যাম্প জ্বলছে। অবনীবাবু শুয়ে আছেন একা। পা টিপে টিপে কাছে গিয়ে রিভলবারটা কপালে ঠেকাই। ট্রিগারে চাপ দিই। ক্লিক করে চাপা শব্দ ওঠে। কিন্তু গুলি বেরোয় না। অবনীবাবু চোখ খুলে আমাকে দেখে হাসেন। ভয়ে আমার মুখ শুকিয়ে যায়। পিছিয়ে আসি। অবনীবাবু নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে ড্রাকুলার মতো—সর্বনাশ! দু কশায় দুটো তীক্ষ্ণ দাঁত নিয়ে উঠে বসছেন। তারপর এগিয়ে আসছেন আমার দিকে। দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়াই। সামনে আসামাত্র চেঁচিয়ে বলি—না! না! না!

—বাণ্ডিল! বাণ্ডিল! এ্যাই শুওর! পাশ ফিরে শো!

ননীদার ডাকে আবার সব ঠিক হয়ে যায়। ননীদা গজগজ করতে করতে থেমে যায়। বালিশের তলায় রিভলবার আর গুলি-গুলো আছে কি না দেখে নিই। তারপর সিগ্রেট জ্বালি। সেই আলোয় ঘড়ি দেখে নিই। সওয়া তিনটে। ওঃ! এখনও কত দেরি ভোর হতে! থাক্—আর ঘুমোব না। শীতের সময় না হলে বাইরে গিয়ে পায়চারি করা যেত।

একটা ঘণ্টা সিগ্রেটের পর সিগ্রেট খেয়ে জেগে থেকে এবং আবোল-তাবোল ভেবে অস্থির হতে হতে উঠে বসলুম।

রিভলবারে পাঁচটা গুলি সাবধানে পুরে পকেটে নিই এবং আন্দাজে এগিযে দরজা খুলি। হ্যাঁ, এটা ভেতরের দিকই বটে। আকাশ নেই—বাল্ব জ্বলছে সিঁড়ির ওপরে। চওড়া সিঁড়ি। গায়ে চিমটি কেটে দেখে নিই—স্বপ্ন কিংবা স্বপ্ন নয়।

সিঁড়িতে পা দিতেই ওপরে কুকুরের গর্জন শোনা যায়। সম্ভবত অবনীবাবুর গলাও শুনতে পাই। কুকুরটাকে ধমক দিচ্ছেন। আবার পা বাড়াতে গিয়ে দ্বিধায় পড়ি। কোথায় যাচ্ছি এভাবে? কুকুরটা সমানে গরগর করতে থাকে। তারপর ওপরে চলাফেরার শব্দ হয়। তখন ডাইনে উল্টোদিকে ঘুরে সরু প্যাসেজ দিয়ে

এগোই। একটু পরেই বাঁদিকে নীচু এক টুকরো উঠোন চোখে পড়ে। তক্ষুণি নেচে উঠি। আমার সামনে ওপাশে নাটমন্দির। তার পিছনে ঠাকুরঘর। দরজায় তালা ঝুলছে—উঠোনের মাথার বাল্বটা সোজাসুজি আলো ফেলেছে তালাটার ওপর। নাটমন্দিরে একটা শূন্য দোলনা ঝুলছে। উঠোন পেরিয়ে নাটমন্দিরে ঢুকি। তারপর সোজা গিয়ে সেই তালাটা ছুঁই। ননীদার গাড়িতে অনেক রকম যন্তর-মন্তর আছে। এসব তালা খোলা তেমন কিছুই নয়। মনে পড়া মাত্র বাইরে যাবার রাস্তা খুঁজি। একটা খিড়কি পেয়ে যাই। দরজা খুলে বেরোতেই প্রচণ্ড ঠাণ্ডা আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। বাগানে এসে পড়েছি। এখন গ্যারেজটা খুঁজে বের করলেই সুরাহা। শিশিরে ভিজতে ভিজতে অবশ হয়ে হাল্কা অন্ধকারে হেঁটে যাই। মনে হয়, বাড়িটা ভয়ে চুপ করে গেছে।

ভোর হবার আগেই আমি আজ একশো মাইল দূরে চলে যাবই যাব।...

সি / তিন

...একটু পরে টের পাই, রাস্তা ভুলে অন্য কোথায় ঘুরে মরছি। ঘাস লতাপাতা গাছপালার মধ্যে এমনভাবে জড়িয়ে পড়েছি, আর এ জীবনে বেরোতে পারব না। ভীষণ ঠাণ্ডায় ঠকঠক করে কাঁপছি। শিশিরে ভিজে খুব ভারি হয়ে যাচ্ছি ক্রমশঃ। ভুলেই গেছি যে গ্যারেজ খুঁজতে বেরিয়েছিলুম। কিন্তু এখন অবাক লাগল, কেন গ্যারেজ খুঁজতে বেরিয়েছিলুম? কিছুতেই মনে পড়ল না।

তারপর মনে হল, এবারও স্বপ্নের মধ্যে আছি। তাই আঙুল কামড়াই। একবার চুল টানি। চুলে বিদ্যুতের শক খাই। তখন

খুব ভয় পেয়ে যাই। সম্ভবত এই বাড়ির আড়ালে একটা মৃতদের এলাকা ছিল; না জেনে ঢুকে পড়েছি। অতএব আমার আর নিস্তার নেই।

আমার শক্তি সাহস উবে যায় ক্রমশ। অন্ধের শক্তিতে উদ্ভিদের চাপচাপ ভিজে নোনা চাঙড় ঠেলে কবর থেকে প্রাণ ফিরে পাওয়া মানুষের মতো ওঠার চেষ্টা করি। এইভাবে জোর খাটাতে গিয়ে অনিবার্যভাবে আমার দুটো হাত প্যাণ্টের পকেটে ঢুকে যায় এবং রিভলবারটা ছোয়া মাত্র এইসব গুরুতর প্রহেলিকা কুয়াশা হয়ে ওঠে।

হুঁ, কুয়াশা; ঘন গভীর কুয়াশা ঘিরে আছে। সেইজন্যেই এমন হচ্ছে। কোথাও আলো দেখি না। শেষ রাতের পৃথিবীর অনেকরকম চেহারা দেখা আছে। এমনটি দেখিনি। রিভলবারটা বের করতে দেরি হয় না। আঙুল আড়ষ্ট না হলে নিস্পন্দতার ওপর পাঁচটা গুলিই চালিয়ে দিতুম। অটোমেটিক পয়েন্ট তিন-আট ক্যালিবারের বিদেশী শয়তানও যেন শীতে আড়ষ্ট। আমি তাকে তুলে ধরে এগোই। কয়েকটি পা। তারপর শক্ত কিছু উঁচু জিনিসের সামনে এসে পড়ি।

বুঝতে পারি এটা পাঁচিল। পাঁচিলের কাছে হঠাৎ নরম অসম্ভব কিছুতে হাত পড়তেই চমকে উঠি। বিশাখা! এইতো বিশাখা! আমার হাতের চাপে ও ঝাঁকুনিতে শিশির ঝরে পড়ে। আরও ঠাণ্ডা। হুঁ, এগুলো ফুল ছাড়া কিছু নয়। পটাপট তুলে ফেলি বাঁ-হাতে। তারপর আবার এগোই। ক্রমশঃ কুয়াশার ভিতর আরও কঠিন কিছু এসে সামনে দাঁড়ায়। তাহলে কি বাড়িটারই চারপাশে ঘুরে মরছি?

এই সময় কোথায় কে কাশল। আবার কুকুর গরগর করে উঠল। কুয়াশা ও নিস্পন্দতার মধ্যে এই দুবারের শব্দ থেকে আমার সাহস ফিরে আসছে। জোরে হাঁটছি। আর কোন উদ্ভিদ নেই। একরকম

শূন্যতা। ঘাসও নেই। শক্ত মাটি পায়ের তলায়। তারপর আবিষ্কার করি. বাড়ির সেই গেটে চলে এসেছি।

এবার গ্যারেজ খুঁজে পাওয়া আর কঠিন হয় না। গেটের কপাটে পিঠ রেখে বাঁদিকটা ঠিক করে নিই। তারপর এগোই। গ্যারেজটা খোলা দেখেছিলুম। তিনদিকে দেয়াল, সামনেটা খোলা একতালা ঘর। লম্বা পা ফেলে এগিয়ে গাড়িটা ছুঁই। তারপর সাবধানে দরজার হাতল ঘোরাতে গিয়ে দেখি শালা ননীদা বাপের গাড়ির মতো লক করে রেখেছে। রাগে দুঃখে কাঁদতে ইচ্ছে করে। কিন্তু কাঁদি না। রিভলবারের গুলিগুলো বের করে নিই। পকেটে রাখি। তারপর নল দিয়ে উইনডোতে ঠুকঠুক আঘাত করি। কাজটা আমার শেখা আছে। কাচের টুকরো সাবধানে তফাতে রাখি—একটার পর একটা। ফোকরটা হাত ভরার মতো চওড়া হলে রিভলবার পকেটে রাখি। কোথায় স্ক্রু-ড্রাইভার, হাতুড়ি আর এসিডের শিশি রাখা আছে, জানি। স্টিয়ারিংয়ের সামনের ড্রয়ার থেকে সেগুলো বের করে নিই। সব দু-পকেটে পুরে বেরিয়ে পড়ি।

কুয়াশা আরও ঘন হচ্ছে। সকালে পৃথিবীর কয়েক ঘণ্টা কুয়াশার মধ্য কাটাবে। এটা ভেবে আমার সাহস বাড়ে। বাড়ির ডাইনে ঘুরে বাগান পাব, জেনে গেছি। তারপর বাঁদিকে ঘুরলে নাটমন্দির। আশ্চর্য, অমন প্রহেলিকার মধ্যেও আমার স্নায়ু ঠিক কাজ করে গেছে। আমি এই গূঢ় শক্তিটার জন্যেই এখনও বেঁচে আছি হয়তো। বাড়িটা সম্পর্কে যা অভিজ্ঞতা হবার, তা ঠিকই হয়ে গেছে।

নাটমন্দিরের সিঁড়িতে উঠতে গিয়ে দেখি কুকুরটা ওপরে গরগর করল আবার। তারপর আবার নিস্পন্দতা। ছোট্ট উঠোনে কুয়াশার ভারি পর্দা থাকায় আমি আপাতত নিরাপদ। তালাটা যত বিশ্বস্ত ভেবেছি, তা নয়। মামুলী সেকেলে তালা। খুলে যায়। ভেতরে ঢুকি। ধূপধুনোর পুরনো ধরনের ভ্যাপসা গন্ধ পাই। একটু ভেবে

দরজা বন্ধ করে দিই। ঘন অন্ধকারে একমিনিট চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকি। তারপর দেশলাই বের করে জ্বালি। পেতলের পিলসুজ দেখতে পাই। তেল নেই, কিন্তু আধপোড়া সলতেটা ভিজে আছে। সেটা অল্প জ্বলে। অল্প আলো। বেদীটা কাঠের। একটা বাকসোর মতো। সেটা জোরে ঠেলতেই সরে গেল। আরও জোরে ঠেলি। ঘষা আওয়াজ ওঠে। তাই থেমে কান পাতি। আবার ঠেলি। আমার সামনে একটা কবরের সমান গর্ত। গর্তের অন্ধকারটা ভয়ঙ্কর লাগে। নার্ভাস হয়ে পড়ি। তারপর মনে পড়ে যায়, রাধাকৃষ্ণের সোনার শরীর। গলার হারে বারোটা মুক্তো। লোভে জিভ বেরিয়ে পড়ে। গর্তে পা রাখি। শক্ত কিছুতে পা ঠেলে। সিঁড়ি কেন যে টর্চটা বাগাইনি! এখন দুঃখ হয়....

দেশলাই জ্বেলে দেখে নিই, ভেতরে গ্যাস জমে আছে নাকি। নেই। দেশলাই কাঠিটা চমৎকার জ্বলে। কিন্তু ভ্যাপসা গন্ধ। কয়েকটা ধাপ নামার পর মেঝে। একজন উঁচু মানুষ দাঁড়াবার মতো ছাদ। তারপর ফের দেশলাই জ্বেলে বেদী খুঁজি।

বেদ আছে। কিন্তু আর কিছু নেই।

একটা কালো ন্যাড়া কবর।

শালা ননীদা!

সোনার রাধাকৃষ্ণ গলায় বারোটা মুক্তোর মালা!

গলায় কান্নার চাপ। শ্বাস কষ্ট। রিভলবারে ঝটপট গুলি পুরে ফেলি। ঘুরি। আর আলোর দরকার নেই। আমার আর কোন কিছু চাই না।

হঠাৎ ওপর থেকে টর্চের আলো এসে পড়ে। তারপর চাপা গর্জন করে কেউ আমার দিকে ঝাঁপ দেয়। কিছু না ভেবেই ট্রিগারে চাপ দিই। পরপর দুবার। এই পাতাল মন্দিরে কামানের শব্দ। বারুদের দুর্গন্ধ। যে ঝাঁপ দিয়েছিল, সে আমার সামনে সিঁড়িতে পড়েছে। গড়িয়ে এসে পায়ে ঠেকতেই লাথি মারি। সেটা চুপ করে

গেছে। ওরা টর্চটা কোথায় পড়েছে, খোঁজার সময় নেই। ও কে তাও দেখাও সময় নেই। গুলির শব্দ ওপরে কতটা পৌঁছল, জানা দরকার। এবং পালানো ছাড়া আর কিছু করারও নেই।

হাঁচড় পাঁচড় করে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠি। বাইরে চাপা কুকুরের গর্জন ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। আন্দাজে পা বাড়িয়ে দরজার কাছে যাই। অবাক হয়ে দেখি, দরজাটা আমার মতো সে ভেজিয়ে রেখেছিল। তাহলে কি···

কিন্তু এখন আর কিছু ভাববার সময় নেই।

তেমনি কুয়াশা আছে। কিন্তু তার মধ্যে ভোরের আলো এসে পড়েছে। নাটমন্দির পেরিয়ে বাগানে যাই। কে কোথায় প্রচণ্ড কাসে। কাসতে কাসতে মরা যাবে কেউ। কেন যে এক্ষুণি মরে যাচ্ছে না। শালা ননীদা···ঠোঁট কাঁপে এবং শালা ননীদা কথাটা মাছির মতো ভনভন করে।

আমাকে পালাতে হবে ভেবে কষ্ট পাই। এই বাড়িতে হয়তো আমার বিশাখাকে দেখেছি। বিশাখার সঙ্গে কথা বলা হল না। এটাই কষ্ট। মনে মনে বলি—আবার আসব বিশাখা। আবার দেখা হবে। আপাতত আজ রাতের একশো মাইল চলে যাওয়া আমার শেষ। এখন বিশ্রাম চাই। ঘর খুজতে হবে। ঘরের জন্যে বাইরে চলেছি। পৃথিবী কত বড়ো। কত ঘর।

গেটের কাছে আসতেই গ্যারেজের দিক থেকে কেউ দৌড়ে আসে। পায়ের শব্দে ঘুরে দাঁড়াই। রিভলবার তুলে ধরি। ইকবালের ডাক শুনি—বাণ্ডিল! বাণ্ডিল!

সে দৌড়ে এসে থমকে দাঁড়ায় চাপা গলায় বলে—কোথায় যাচ্ছিল তুই? ননীদা এক্ষুণি এসে যাবে। গাড়ি রেডি। গাড়িতে আয়।

আমি কিছু বলি না। সে আমার কাঁধে হাত রেখে টানে। গ্যারেজে নিয়ে যায়। পুতুলের মতো এগোই। সে ফিসফিস করে

বলে—অদ্ভুত ব্যাপার? কাচ ভাঙার কি দরকার ছিল? যাক্‌ গে, বেশী বলার সময় নেই। ননীদা। এলেই ষ্টার্ট দিয়ে বেরোব। তুই গেটের কাছে নেমে ফটক খুলে দিবি।

সে ষ্টিয়ারিঙে বসে। আমি মুখ খুলি।—ষ্টার্ট দে।

—ননীদা আসুক।

—ননীদা আসবে না।

—আসবে না। ষ্টার্ট দে।

—কী বলছিস!

—চুপ্‌। আমার মাথার ঠিক নেই। গুলি বেরিয়ে যাবে। ষ্টার্ট দে।

ইকবালের চোখ জ্বলছে। সে সবকিছু বুঝতে চেষ্টা করছে হয়তো। আমি গরগর করে উঠি আবার—আর তিনটে গুলি আছে, ইকবাল। দুটো তোর জন্যে, একটা আমার নিজের। ষ্টার্ট দে।

পাঁচটা গুলির খবর ইকবাল জানে। সে হঠাৎ ষ্টার্ট দেয়। ভাঙা জানলা নিয়ে গাড়িটা প্রায় লাফ দিয়ে বেরোয়। কুয়াশার মধ্যে কে চেঁচিয়ে ওঠে। আমরা গ্রাহ্য করি না। গেটের কাছে পৌঁছে এক লাফে নামি। আগড় তুলে কপাট দুটো ফাঁক করে দিই। গাড়ি বেরিয়ে গেলে দৌড়ে গিয়ে চাপি। পিছনে কেউ চেঁচায়। অজানা ভাষা। আমরা অন্য দেশের লোক। অন্য ভাষা।

ভোরের কুয়াশায় হেডলাইট জ্বলে ওঠে। গাড়ি প্রচণ্ড জোরে চলতে থাকে। নিঃঝুম বাজার ছাড়িয়ে যেতে যেতে দেখি বারান্দায় ভিখীরিরা শুয়ে আছে। এখন ও রকম শোয়ার জন্যে কী যে লোভ হয়। খোলা রেলগেট পেরিয়ে গিয়ে মাঠে পড়ি। কনকনে ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটানি আসে। ইকবালের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আমার দিকটায় আরাম। ইকবাল দাঁত কিড়মিড় করে বলে—বাষ্টার্ড!

শোভানাল্লা আরামে হেলান দিই।...

মাঝে মাঝে সামনে থেকে বিশাল ট্রাক আসে এবং শব্দ করে সরে যায় পিছনে। দুধারে মাঠের ওপর কুয়াশায় লালচে আলো। ছোটখাট বসতি আবার মাঠ। হলুদ ধানক্ষেতের ওপর কুয়াশার নীলপরী। পৃথিবীর এসময় খুব সুন্দর দেখায়।

তারপর একটা সদ্যঘুমভাঙা বাজার এল। আমি এতক্ষণে ফের কথা বলি—চা!

ইকবাল গাড়ির স্পিড কমায়। আমার দিকে তাকায় না। বলে—নামা চলবে না। তারপর সে গাড়িটা একটা চায়ের দোকানের কাছ ঘেঁষে দাঁড় করায়। মুখ বাড়িয়ে বলে—দাদু, দুটো চা।

আমরা প্রথম চা খাচ্ছি ওর কাছে। খুব সম্ভ্রমের ভাব দেখিয়ে সে চা করতে থাকে। তারপর ফিক করে হেসে বলে—এ্যাকসিডেণ্ট হয়েছিল, স্যার?

—হু।

—আর বলবেন না। ট্রাক ড্রাইভারগুলো বড্ড···

—জায়গাটার নাম কী, দাদু?

—নন্দীগ্রাম।

ষ্টেশন আছে এখানে?

রেলের? আছে। একটু এগিয়ে ডাইনে ঘুরবেন।

চা দুটো নিয়ে সে শ্রদ্ধা দেখিয়ে পাশে দাঁড়ায়। ভাঙা জানলাটা খুঁটিয়ে দেখতে থাকে। ইকবাল আমাকে চায়ের কাপ দেবার সময়ও ঘোরে না।

চা খেয়ে চাঙ্গা হয়ে উঠি। যথারীতি বলি—শোভানাল্লা!

ইকবাল চায়ের দাম ও কাপ প্লেট ফেরত দিয়ে গিয়ার টানে। গাড়ি আবার চলতে থাকে। ডাইনে ঘুরে সত্যিসত্যি ষ্টেশনে যাচ্ছে দেখেও কিছু বলি না। সে আমার দিকে একবারও তাকাচ্ছে না।

এতে আমার পক্ষেও স্বস্তি। ও তাকালেই ননীদা এসে পড়ার চান্স আছে।

ষ্টেশনের নীচে বড়ো চত্বরে অনেক রিকশো দাঁড়িয়ে রয়েছে। কুয়াশা ভেদ করে আরামের রোদ ফুটেছে। গাড়ি একপাশে রেখে ইকবাল নামে। আমিও।

সে পেছনের দরজা খুলে দুটো কিটব্যাগ নেয়। একটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে—ননীদার। তারপর নিজেরটা কাঁধে ঝুলিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ষ্টেশনের গেটে উঠতে থাকে। একটু দাঁড়িয়ে থাকি তখন দেখি সে গেটের কাছে ঘুরে দাঁড়িয়ে আমার দিকে এই প্রথম তাকাল। তার মুখটা বরফের মতো সাদা দেখাল। চোক নিষ্পলক। মুখে কোন ভাব নেই।

আমি দৌড়ে তার কাছে যাই। তখন সে ঘুরে গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢোকে। কয়েক পা এগিয়ে ওর কাঁধে হাত রাখি।—কোথায় যাচ্ছি আমরা?

—কলকাতা।

—গাড়িটা?

—রইল।

সে দাঁড়িয়েই থাকে, যতক্ষণ আমি কথা বলি না। তারপর বলি —আমি কলকাতা যাব না।

—কোথায় যাবি?

—অন্য কোথাও।

ইকবাল ঘুরে বলে—না!

আমি আরও স্পষ্ট এবং দৃঢ়তার সঙ্গে বলে উঠি—না।

ইকবাল আমার মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকার পর হাল ছেড়ে দেয়। একটা বড়ো নিঃশ্বাস ফেলে বলে—বেশ। তবে···

সে হঠাৎ হাঁটতে থাকে। বলি—তবে কী?

—আর কখনো কলকাতা যাসনে।

—কেন?

—তোর বিপদ হবে।

—কী বিপদ?

ইকবাল প্লাটফর্মের অল্পস্বল্প ভীড়ের তোয়াক্কা না করে চাপা চেঁচিয়ে ওঠে—তুই কচি খোকা. বাঞ্চোৎ? ননীদার কেউ নেই ভেবেছিস! তারা তোকে ছেড়ে দেবে না।

সে কোথায় যাচ্ছে, বুঝতে পারিনে। তার পিছনে এগিয়ে যাই।

প্লাটফর্মের নির্জন জায়গায় গিয়ে সে দাঁড়ায়। ফের বলে—তুই—তুই কী বাণ্ডিল! যে তোকে বাঁচাল, জায়গা দিল, তাকে তুই… হঠাৎ সে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে।

আমি খুকখুক করে হাসি। দুহাতে মুখ ঢেকে শুয়োরের বাচ্চাটা সমানে কাঁদে। সেই কান্না দেখতে দেখতে আমার রাগ হয়।

—থামবি?

ইকবাল ভাঙা গলায় বলে—তুই আমার বাবাকে মারলেও কিন্তু যেত আসত না বাণ্ডিল! তুই আমার পায়ের তলার মাটি সরিয়ে দিয়েছিস। এর শোধ আমি নেব।

—এক্ষুণি নে। আয়, ডুয়েল লড়ি।

—তুই হাসছিস? বেইমান! ট্রেচারাস!

—তোর গালাগালিতে রাগ আরও মিইয়ে যাচ্ছে।

ইকবাল পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মোছে। তারপর সিগ্রেট ধরায়। টিকিটের ঘণ্টা বেজে ওঠে। তখন সে বলে—মাদারিপুর পাম্পের সব মালকড়ি ওই ব্যাগে আছে। আমি এক পয়সাও নেব না। তুই যা খুশি করিস।

—কলকাতা ফেরার পয়সা লাগবে না তোর?

—আছে।

একটু চুপ করে থাকার পর ফের সে আস্তে বলে—তোকে কাল

ডাকতে চাননি ননীদা। আজকাল সবসময় বলতেন—বাণ্ডিলটাকে নষ্ট.হতে দেব না আর। ও আলাদা লাইনের ছেলে। আশ্চর্য, ননীদা তোকে চিনতে পারেন নি

—টিকিট কাটবি নে?

সে কথার জবাব না দিয়ে ইকবাল দূরের দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর হঠাৎ ঘুরে তর্ক করার ভঙ্গীতে বলে ওঠে—কেন খুন করলি ননীদাকে?

—চিনতে পারিনি!

—মিথ্যে বলছিস!

আমি চুপ করে থাকি। আসলে ব্যাপারটা বিষাক্ত সাপের উপমা দিলে বোঝানো যায়। গোখরো সাপ ইচ্ছে করেই কামড়ায় না। কামড়ায় আতঙ্কে

—ননীদা টের পেয়েছিলেন, তুই কী মতলবে বেরিয়েছিস। তোকে সাবধান করতে গিয়েছিলেন।

—সোনার রাধাকৃষ্ণ আর বারোটা মুক্তোর মালা······

—চুপ। তুই যাতে না বিপদে পড়িস······

—তোকে নিয়ে মজা করার জন্যে···

—সোনার রাধাকৃষ্ণ···

—পাগোলের সঙ্গে কী বলছি! বলে ইকবাল হনহন করে টিকিট ঘরের দিকে চলে যায়।

মজা করার জন্যে কিংবা আমাকে বিপদ থেকে বাঁচাতে গিয়েছিল ননীদা! হুঁ, তাই গ্যারেজে ইকবালকে রেডি থাকতে বলেছিল! ইকবাল ওকে চেনেনি। আমি চিনতুম। এখন আরও চিনতে পারছি। সব মনে পড়ে যাচ্ছে—দিনের পর দিন, রাতে পর রাত যা কিছু ঘটেছে। বোকা ইকবাল টের পাচ্ছে না, কোন-না-কোনদিন আমি ননীদাকে মারতুমই। সে আমাকে বাঁচিয়েও মৃতদের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে—আমার সত্যিকার পরিচয় এখন

মৃতদেহ তালিকায় থানার দেয়ালে—দেয়ালে সেই নাম লেখা আছে। এটা ক্ষমা করা যায় না। আমি ওকে ক্ষমা করতে পারি নি। আমার মধ্যে থেকে বার বার বিপ্লব নামে একটি ছেলে ঠেলে উঠতে চেয়েছে—আর ঐ লোকটা তাকে থাপ্পড় মেরে বসিয়ে দিয়েছে।

অতএব আমার এতটুকু অনুতাপ হচ্ছে না। শক্তপায়ে দাঁড়িয়ে সিগ্রেট টানতে থাকি। রোদের তাপ আমাকে ক্রমশঃ চাঙ্গা করে। শুধু রোদের জন্যেই এমনি দাঁড়িয়ে অনন্তকাল কাটানো যায়।

দেখলুম ডাউন ট্রেণটা এল। তারপর ছেড়ে গেল। জানালায় ইকবালের মুখ দেখলুম—নাকি চোখের ভুল। মনে হল, নিষ্পলক আর নির্বিকার সাদা একটা ছবির মুখ। আমি হাত নাড়লুম, কিন্তু সে একটুও নড়ল না।

আমি হাত নাড়ি। ট্রেণটা চলে যাওয়ার পরও হাত নাড়ি। একটা কুকুর এসে আমার হাঁটুর কাছটা শুঁকে ঘেঁউ ঘেঁউ করে ওঠে। তখন হাত নামিয়ে তাকে তাড়া করি। তারপর ভাবনায় পড়ে যাই।

সি / চার

রেল-লাইন ডিঙিয়ে গিয়ে একটা বড়ো পুকুর, তার ঘাটটা বাঁধানো। খুব পুরানো ঘাট মনে হচ্ছিল। নির্জন। সেখানে বসে কিটব্যাগ খুলি। একগাদা আগোছাল দুমড়ানো নোট। হাত ভরে কিছুক্ষণ বসে থাকি। কিছুক্ষণ ভাবি। হাত গরম হয়ে ওঠে। কিংবা সুড়সুড় করে। গোপালবাবুর টাকা, এখন তুমি কার?

কাগুজে কণ্ঠস্বর শুনি—এখন তো তোমারই। গোপালবাবুর টাকা! তোমার সঙ্গে আড়ি। টাকা আমার আঙুল আঁকড়ে ধরে। খুব মজা পাই। শোভানাল্লা! টাকার সঙ্গে মজা করার এই ভাগ্য কারও হয় না। মজাটা খুব ভালভাবে করা যেতে পারে।

চারিদিকে তাকাই। পিছনে রেল-লাইন, সামনে ডাইনে বাঁয়ে মাঠ। মাঠে হলুদ ধানক্ষেত। কেউ কোথাও নেই। নোটগুলো বের করে দু-পায়ের ফাঁকে ভিজে ধাপের ওপর রাখি। তারপর ননীদার একটা গেঞ্জি দেখতে পাই। গেঞ্জিটা ময়লা। তার তলায় একে-একে বেরিয়ে পড়ে সেফটি রেজার, দাঁতের ব্রাশ, পেস্ট, ছোট্ট আয়না, জিভ সাফ করার ব্যবস্থাও। লোকটা খুব নিষ্ঠাবান ছিল। ওর আটপৌরে বেঁচে থাকার এই চেষ্টাটা এতদিন লক্ষ্য করি নি। এখন অবাক লাগল।

এরপর হাতে এল একটা মানিব্যাগ। গা শিউরে উঠল। ননীদা খুব জলজ্যান্ত হয়ে হাতে এসে পড়েছে। বুকে চাপা কাঁপুনি শুরু হল। তারপর আরও অবাক হয়ে দেখি, আমার ভীষণ কাঁদতে ইচ্ছে করছে। আমার চোখ ফেটে জল আসছে। মানিব্যাগটা দু'হাতে বুকে চেপে ধরে হু হু করে কেঁদে ফেললুম।

কাঁদতে কাঁদতে হঠাৎ থেমে যাই। নিজের ওপর ক্ষেপে থুথু ফেলি। জলে একটু-একটু কুয়াশা উড়ন্ত সুতোর মত ঘুরছে। থুথুর ওপর ক্ষুদে মাছের ঝাঁক ঝাঁপিয়ে পড়ে। মানিব্যাগ খুলি। শোভানাল্লা! এ কিসের ফটো?

ফটো বের করে দেখতে থাকি। একটি স্ত্রীলোক। যুবতী তো বটেই। দারুণ চেহারা! ননদীর ফিঁয়াসে? ননীদার কে কোথায় আছে, আমি জানতুম না। শুধু জানতুম, ও বিয়ে করেছিল—বউ মারা যায়। নিশ্চয়ই এই মহিলা সেই বউ নয়।

কেন নয়, তার কোন যুক্তি নেই। কিন্তু আমার মনে হল, এ ননীদার বউ নয়। নিছক প্রেমিকা। এরকম চাউনি বউদের

থাকতে পারে না। অনেক লোকের বউ আমি দেখেছি। আমাকে শেখাতে এসো না।

কয়েকটা চিঠি আর টুকরো কাগজ বেরুল। প্রথমে টুকরো কাগজগুলো দেখে নিলুম। সংক্ষিপ্ত ঠিকানা লেখা। নামগুলো অজানা। দুটো ভাঁজ করা ইনল্যাণ্ড, একটা পোস্টকার্ড। পোস্টকার্ডটা বাংলাদেশের। ১৯৬৮ সালে ঢাকা থেকে কেউ লিখেছে—হয়তো আত্মীয়, মামুলি ব্যাপার।

উঁহু। তাহলে ননীদা চিঠিটা রেখেছিল কেন? খুঁটিয়ে পড়ে আবিষ্কার করি, এটা ননীদার বাবার চিঠি। কান্নাকাটি করে লেখা। অসুখ সারাতে কলকাতায় নিয়ে যাবার বায়নাক্কা। একটা ইনল্যাণ্ড খুলে ফের গা শিউরে ওঠে। মেয়েলি হাতের লেখা এবং নিছক প্রেমপত্র। এও একই বায়নাক্কা। তলায় পুরো নাম নেই, শুধু 'সু'।

দ্বিতীয় ইনল্যাণ্ডটা খুলে আর চমকাই না। একই মেয়ের চিঠি। কিন্তু এবারে লেখা আছে সুষমা। কোন তারিখ নেই। তাই পোস্টাপিসের ছাপটা খুঁটিয়ে লক্ষ্য করি। দুটোই আমহার্স্ট স্ট্রীটের ছাপ। তারিখ আরও অস্পষ্ট। কিন্তু সালটা চলতি। তার মানে ননীদা বুড়ো বয়সে চুটিয়ে প্রেম করে যাচ্ছিল। আমি একটা দাঁড়ি টেনে দিলুম তাতে। আবার আমার চোখ দিয়ে জল ঝরতে থাকে। খুব আরামে কান্নাকাটি করি তারপর মনকে বোঝাই, ব্যাপারটার জন্যে সত্যি সত্যি আমি দোষী নই। ওটা দৈবাৎ ঘটে গেছে। এ্যাক্সিডেন্ট!

তখন মন বেশ শান্ত হয়। সিগ্রেট জ্বেলে জ্বলন্ত দেশলাই কাঠিটা নোটগুলোর মধ্যে গুঁজে দিই। পা দুটো অনেকটা ফাঁক করে রাখি। বেশ ভালই পুড়তে থাকে। গোপালবাবুর টাকা! এখন তুমি কার? গোপালবাবুর টাকা বলে—ঈশ্বরের!

তবু যন্ত্রণায় দুমুড়ে যায় টাকার কালো শরীর। ছটফট করে। আমি মুখ টিপে হাসি। নাকে ধোঁয়ার গন্ধ লাগে। কিন্তু হাতদুটো

সেঁকে আরাম পাই, ঠোঁটে সিগ্রেট। পুড়ে যেতে যেতে গোপালবাবুর টাকা ঈশ্বরের টাকা হয়ে যেতে যেতে কি আমাকে অভিশাপ দিয়ে যায়? একটু অস্বস্তি হয় শেষ অব্দি। শেষ গোছার নোট পোড়াতে আবার দেশলাই জ্বালি।

এই সময় আমার গায়ে ছায়া পড়ে। সাপের মতো মাথা তুলি। ঘুরে দেখি একগাদা কাপড় কাচতে আসা একটি যুবতী ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে। যুবতীটি রেলের নিচুতলার স্টাফের বউ-টউ হতে পারে—না, বউ নয়। বিয়েই হয় নি। আমি মুখ ঘুরিয়ে নিই।

সে আমার পেছনে ঘুরে ধাপে নেমে জলের মধ্যে নেমে দাঁড়ায়। তারপর শান্তস্বরে বলে—ওগুলো কী পোড়ালেন?

না তাকিয়ে ঠোঁটে হাসি রেখে বলি—কিছু না। কাগজ।

—নোট মনে হল।

—যাঃ! নোট কেউ পোড়ায় নাকি?

—পোড়ায় বইকি। আমার বাবা মদ খেয়ে একবার একশো টাকার নোট পুড়িয়েছিল!

—আমি মদ খাই নি। কে তোমার বাবা?

—পয়েন্টসম্যান ছিল। মারা গেছে। আমার দাদা এখন সেই চাকরি পেয়েছে।

—তাই বুঝি?

—হ্যাঁ। আপনি কোথায় থাকেন?

মুখ তুলে তাকাই। ওর কথার মধ্যে সরলতা অথবা স্পষ্টতা, নাকি সাহস—যা আমাকে আকৃষ্ট করে। ওকে খুব ভাল লেগে যায়। ওর চেহারাও মন্দ নয়—আর ওর বয়স, যা যুবকদের টানে। আমার দৃষ্টি ওকে আড়ষ্ট করে। দৃষ্টি ঘুরিয়ে জলে রাখে। আমি আস্তে বলি—তোমার নাম কী?

—মালতী।

—বাঃ!

—আপনি কলকাতায় থাকেন?

—হ্যাঁ।

—ট্রেন ফেল করেছেন বুঝি? আবার সেই বারোটা অব্দি বসে থাকতে হবে।

ওর কৌতূহল হঠাৎ মরে যায়। সে জলের দিকে ঝোঁকে। অস্ফুটে বলে—ইস্! কী ঠাণ্ডা! তারপর আমি তাকে দেখছি টের পেয়ে পাঁজরের দিকটা আলতো হাতে ঢেকে কোমরে কাপড় গোঁজে। জলের মধ্যে কাপড়গুলো পায়ে ঠেলে দেয় এবং বসে। আমি বলি —গোট পোড়াচ্ছি ভাবলে কেন?

—দেখলুম, মনে হল। বলে সে সাবান ঘষতে থাকে।

আমি ডাকি—মালতী!

সে ঘোরে। সোজাসুজি তাকায়। একটু বিস্ময় ঝিলিক দেয় ছুটো চোখে। এভাবে নাম ধরে ডাকাটা তাকে নিশ্চয় চমকে দিয়েছে।

কিছু বলার না পেয়ে মাঠ দেখতে দেখতে বলি—ওদিকে কোন রাস্তা নেই? ওর বিস্ময় দমে যায় তখুনি। উৎসাহ দেখিয়ে বলে —আছে। নীচের রাস্তা। বাস যায়। ওই যে!

—কোথায় গেছে রাস্তাটা?

—অনেকদূর। ওই গাঁ দেখছেন, বকুলতলা। বড় গাঁ। তার পাশেই গঙ্গা। গঙ্গায় এখনও ব্রীজ হয় নি। নৌকো আছে। নৌকোতে বাস পেরিয়ে যায়। তারপর—

ওর বলার মধ্যে পেশাদার গাইডের ঢঙটুকু তো আছেই, আরও কী আছে। যেন এইসব দেশ মাটি গাছপালা পথঘাট নাড়ি-নক্ষত্রের খবর দিয়ে ও খুশী—নিজের বাড়ির লোকজনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। তারপর···বলে সে থেমেছে এবং আমি তাকিয়ে আছি, শুনছি, অথবা আগ্রহ দেখাচ্ছি ভেবে সে নল থেকে জল পড়ার মতো বলে চলে···।

—তারপর আমিনগঞ্জের বাজার। ঘাটের ওপর ছোট্ট বাজার ব্লক অফিসের পাশের মাঠে একজিবিশনের মেলা বসেছে পাঁচ কিলো মূলো দেখেছেন কখনো?···সে হি-হি করে হেসে ওঠে।

তার এই হাসিটা আমাকে নাড়া দেয়। খুব চেনা মনে হয়। ওই কি বিশাখা···বলতে না বলতে একশো মাইলের গান ঝড় হয়ে আছড়ে পড়ে। প্রতিশ্রুতি থরথর করে কাঁপে। বাচ্চা ছেলের মতো হাউমাউ করে কেঁদেকেটে বলতে ইচ্ছে হয়—বিশাখা, আমি! আমি!

—কলকাতার দল থিয়েটার করে গেল পরশু রাতে। কাল থেকে যাত্রা চলছে। আজ আমি যাবই। বউদি যাক্ না যাক্, আমি বাবা যাচ্ছি!···থপথপ করে কয়েকবার সাবানের ফেনা মাখানো কাপড় কেচে নেয় সে। আবার বলে—আমি যাবই। আর তার এই ছোট্ট কথা গমগম করে বাজতে বাজতে হানড্রেড মাইলসের অর্কেস্ট্রায় মিশে যায়। তাকিয়ে দেখি বিস্ময়কর সব নীলরঙের ঘোড়া ডিসেম্বরের হলুদ মাঠে এসে দাঁড়িয়েছে। বোকা মুখ্যু গাঁয়ের চাষারা কাস্তে হাতে দাঁড়িয়ে ভয়ে ভয়ে তাকাচ্ছে, ধানক্ষেতে এই অলীক উপদ্রব! ক্ষুরের আঘাতে সোনালী ধানের শীষ আকাশে ছড়িয়ে পড়েছে।

আমি সোজা ডেকে ফেলি—বিশাখা!

সে তক্ষুণি হাসে। ঘাড়ে নাড়ে। —আমার নাম মালতী।

—না। তুমি বিশাখা!

সে চমকায় এবার। কেমন চোখে তাকিয়ে বলে—আপনি ভাল লোক না। যা তা বলবেন না!

আমার জেদ চেপে যায়।—যা তা কিছু বলিনি বিশাখা! তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ার দরকার ছিল। জানো তো?

আমি উঠে দাঁড়িয়ে একধাপ নামি। অমনি সেও উঠে দাঁড়ায়।

হিসহিস করে বলে ওঠে—আপনাকে ভাল ভেবেছিলুম। খবর্দার! দাদাকে ডাকবো!

কাতর হয়ে হাত বাড়িয়ে দিই।—কিছু না, এ কিছু না। আমি তোমাকে একবার ছোঁব। তোমার হাত দাও, লক্ষ্মীটি!

সে পাশ কাটিয়ে ওপরে ওঠার চেষ্টা করে। তারপর ধাপের ওপর পা পিছলে পড়ে যায়। পড়ে গিয়েই জোরে চেঁচিয়ে ওঠে—দাদা!

আমার মাথায় খুন চড়ে যায়। নীল ঘোড়াগুলো এবার আমার চারপাশে বৃত্ত ছোট করে এনেছে। তাদের ক্ষুরের ঘণ্টানি শুনতে পাচ্ছি। তাদের কষায় ফেনা এবং শ্বাসপ্রশ্বাসের গন্ধ এসে ঝাপটা মারছে। আমি চাপা গর্জন করে উঠি—চুপ্!

সে ভয়ে কাঠ হয়ে নিষ্পলক তাকায়। তার হাত ধরে টেনে দাঁড় করিয়ে দিই। তখন হাতটা ছাড়িয়ে নেয়। ঘুরে দাঁড়ায়। তার পিছনটা কাঁপে।

হঠাৎ আবিষ্কার করি, আমার ডান হাতে রিভলবার। ক্ষোভে দুঃখে বুক ভেঙে যায়। বাঁ-হাতে ছুঁয়েছি তাহলে! কিছুতেই আমার ডান হাতটা খালি করা যাচ্ছে না। হঠকারিতায় রিভলবারটা জলের দিকে ছুঁড়ে ফেলি। এক দঙ্গল শালুক পাতার ওপর গিয়ে পড়ে এবং আস্তে আস্তে ডুবে যায়।

সে ঘুরে ব্যাপারটা দেখে এবং তারপর শালুকপাতাগুলোর দিকে একবার, একবার আমার দিকে তাকায়। তার ঠোঁট কাঁপে। কিন্তু কিছু বলে না।

আমি বড় একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলি—আচ্ছা, চলি। তারপর ধাপ বেয়ে উঠে সোজা হাঁঠতে থাকি। ধানক্ষেতে কাদা আর জল ভেঙে এগিয়ে যাই পিচের রাস্তাটার দিকে। রাস্তায় ওঠার পর ঘুরে একবার দেখে নিই। সে তেমনি দাঁড়িয়ে আছে এদিকে তাকিয়ে। রাস্তা ধরে যেতে যেতে যতবার ঘুরি, তাকে একইভাবে দেখতে পাই।

তখন মনে একটা গভীর তৃপ্তি জেগে ওঠে। খুব হাল্কা লাগে। উত্তরের বাতাস এতক্ষণে বইতে শুরু করেছে। ঘড়ি দেখে নিই—সকাল আটটা। একটা শুভ লগ্ন এসেছিল। গুনগুন করে গান গাই। কিটব্যাগটা আশ্বস্ত হয়ে আমার পিঠে ঘুমোয়।

এক কিলোমিটার পেরিয়ে দেখি রাস্তাটা গাঁয়ে ঢুকেছে। ডাইনে বিশাল একটা ভাঙাচোরা বাড়ি—তার প্রকাণ্ড গেটের একপাশে মার্বেলে খোদাই করা আছে 'সন্ধ্যানীড়।' অন্য পাশের মার্বেলে 'খানবাহাদুর মজিরুজ্জমান চৌধুরী এম-এ, বি-এল লেখা। গেটের কপাট ভাঙা এবং পুরোটা খোলা। ভেতরে লন মতো আছে—ঘাস, আগাছায় ভরা। তার মধ্যে পায়ে চলার একটু রাস্তা। তারপর বাড়ির দরজা। একপাশে উঁচু খোলা বারান্দা। তার সামনে ঘর। বারান্দায় রোদে ইজিচেয়ারে এক বুড়ো বসে আছেন। তাঁর চুলদাড়ি সাদা। পাশে একটা টুলে ছড়ি আর এনামেলের বদনা রয়েছে। আমি দাঁড়িয়ে আছি, হঠাৎ একজন লোক যেতে যেতে থমকে দাঁড়ায়। ভুরু কুঁচকে বলে—তুমি মুকুল না ?

একটু হেসে তার দিকে তাকিয়ে থাকি। সে কাছে এসে তীক্ষ্ণদৃষ্টে আমাকে দেখে নিয়ে বলে—হায় খোদা ! কোথায় ছিলে এ্যাদ্দিন ! এদিকে চৌধুরীসাহেব কেঁদে কেঁদে অন্ধ হয়ে যাবার দাখিল। কী ছেলে রে বাবা। যাও যাও, আব্বার কাছে যাও !

গাঁয়ের লোক বড্ড হুজুগে, ইকবাল বলত। ও কথা বলার সময় আরও দু-জন এসে পড়ে। একটা হইচই লেগে যায়। ওদের হইচই থেকে আঁচ করে নিই, মুকুল নামে এবাড়ির একটা ছেলে বছর সাতেক আগে নিরুদ্দেশ হয়েছে। খুব দুষ্টু ছেলে ছিল নাকি। বাবার অনেক টাকাকড়ি নিয়ে পালিয়েছিল। একজন বলে দেয়—তোমার চাচারা চাচাতো-ভাইবোনেরা বাংলাদেশ থেকে গতমাসে এসেছিল। তোমার আব্বাকে সাধাসাধি করলেন। উনি যাবেন না। অন্যজন বলে—গেলে তোমার বোনেরও বিয়েটা ওখানে হয়ে যেত। এখানে একলা

দোকলা থাকে—আব্বার তো ওই অবস্থা। আরেকজন বলে—তোমার আক্কেল কী রকম বাবা? সে আক্কেল কী আর আছে? তোমার দাদু খান বাহাদুরসাহেব বেঁচে থাকতে তখন একরকম অবস্থা ছিল। এখন আরেক জমানা। সাবালক ছেলে তুমি!

আমি এসবের বিরুদ্ধে কিছু বলতে পারতুম। কিন্তু কেমন অবশ হয়ে গেছি। এই মানুষগুলো পৃথিবীর পুরানো স্নেহ-মমতা দিয়ে আমাকে দেয়ালের মধ্যে ঘিরে ফেলেছে। হায়! কেন আমি মুকুল হয়ে জন্মাই নি!

দেখি, আমাকে ঠেলে নিয়ে চলেছে সেই দেয়াল। উঁচু বারান্দা থেকে বুড়ো লোকটি বার বার প্রশ্ন করছেন—কী হল? কী হল? এরা বারবার জবাব দিচ্ছে—মুকুল চৌধুরীসাহেব! আপনার ছেলে মুকুল ফিরে এসেছে!

চৌধুরীসাহেব সোজা হয়ে বসলেন। যেন ভুল শুনছেন, এভাবে চেঁচিয়ে উঠলেন ভাঙা গলায়—কে? কে?

—মুকুল! আপনার মুকুল!

ওঁর চোখদুটোর দিকে তাকিয়ে দেখি ঢেলা বেরিয়ে রয়েছে। দেখার চেষ্টা করছেন। ঠোঁট কাঁপছে। তারপর উনি হেলান দিয়ে বসেন। বিড়বিড় করে কিছু বলেন। লোকগুলো আমাকে ওর সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়।

একটু ইতস্ততঃ করি। ইকবাল আমাকে অনেক মুসলমানী রীতি শিখিয়েছিল। সেগুলো এখন কাজে লাগানো যায়। আমি ঝুঁকে ওঁর দুপায়ে দুই হাতের আঙুল ছুঁয়ে তারপর সেই আঙুল ঠোঁটে ঠেকাই: তিনবার। শেষবার ওঁর দুটো কাঁপন্ত হাত আমার দুই কাঁধে ও মাথায় পড়ে এবং টের পাই, আমাকে টেনে উনি বুকে শুইয়ে দিলেন। মানুষটি বেশ লম্বা চওড়া। আমার কী যে হয়ে যায়, বুকে শুয়ে ভীষণ কাঁদতে থাকি। বার বার বলি—আব্বা! আব্বা!

—আমি রাগ করিনি, রাগ করিনি,…বলতে বলতে আমাকে জড়িয়ে ধরে উনি উঠে দাঁড়ান। আবার বলেন—আমি আর চোখে দেখি না। কানেও কম শুনি। তোমার আম্মার মৃত্যুর পর থেকেই তো শরীর ভেঙেছিল।

আমি ওঁকে চলতে সাহায্য করি। উনি শক্তি ফিরে পাচ্ছেন। স্বাভাবিক স্বরে কথা বলতে থাকেন। —চিঠি লিখলে কী হত, বুঝি না। কাগজে তিন দফা বিজ্ঞাপন দিয়েছিলুম। তারপর…তারপর আশা ছেড়েই দিতে হল। বকুল। বকুল তুই কোথায়?

এতক্ষণে দেখলুম ঘরের দরজার কাছে একটি অসম্ভব ফর্সা—পাতা চাপা ঘাসের মতো শরীর, মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে। পাতলা ঠোঁট লালচে কাঁপছে। ঘন কালো টানা চোখের পাপড়ি কাঁপছে। গাল জলে ভেসে যাচ্ছে। সে অস্ফুট স্বরে সাড়া দেয়—আব্বা!

—বকুল! এই দ্যাখ, হারামজাদার এ্যাদ্দিনে বাড়ির কথা মনে পড়েছে। নেমকহারাম—বরাবর ও নেমকহারাম!

বৃদ্ধ কেঁদে ওঠেন। ওকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বকুলের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টে তাকাই। সে কি আমাকে তার ভাই বলে মেনে নিয়েছে?

আমি কাছাকাছি হতেই ওর চোখে—না, আমারই ভুল। চোখ মুছে সে আমার হাত ধরে। বৃদ্ধ আমার কাঁধে বাঘের থাবা হাঁকড়ে বলেন—আয়! বকুলও বলে—এস।

এটা বসার ঘর। ভেতরের বাড়িতে ঢুকে চকমিলান চওড়া উঁচু বারান্দায় পৌঁছই আমরা। বাইরে জটলা চলতে থাকে। শুনে একটু অস্বস্তিও হয়। কিন্তু তক্ষুণি তা কাটিয়ে বকুলকে বলি—আমি চলে যাবার সময় তোর বয়স কত ছিল রে?

বৃদ্ধ বলে দেন—ওর তখন এগারো, তোমার ষোল। পারুল এ্যাদ্দিন বাঁচলে একুশ হত। তোমার বার্থডে সামনের মার্চে। চব্বিশে পড়বে।

বকুল আমার হাত ধরে বারান্দায় তক্তপোষে বসিয়ে দেয়।

তারপর দৌড়ে চলে যায় ওপাশে। বৃদ্ধ ডাকেন—মায়মুনা! এক বালতি পানি দে! গরম করে দিস।

থামের ওপাশ থেকে এক কালো কুচ্ছিত বুড়ী আমাকে দেখছিল। এবার একগাল হেসে এগিয়ে আসে। এর চোখকে ফাঁকি দিতে পারব তো?

সে বলে—তোমাকে যে চেনাই যায় না, ভাইজান! ওরে বাবা! কত বড় হয়েছ তুমি?—বলতে বলতে সে এসে আমাকে তার নোংরা শরীরে ঠেসে ধরে এবং বিকট কান্নাকাটি জুড়ে দেয়। আমার কপালে তার লালাসমেত ঠোঁট পড়ে। আমার মাথা তার বুকের মধ্যে। দুর্গন্ধে ঘেন্না ধরে যায়। স্নান করব ভেবে সব মেনে নিই। একটা দিন এবং রাত্রি আমার বিশ্রাম চাই। তারপর সব ঠিক হয়ে যাবে। একশো মাইল যাত্রার এই সবে শুরু।

বকুল ভাঙা বাড়িটার মধ্যে হরিণের মতো ছোটাছুটি করে। কী করবে ভেবে পায় না। তারপর হঠাৎ এসে আমার হাত ধরে টেনে বলে—আয়, তোকে একটা মজার জিনিস দেখাব!

সি / পাঁচ

ওপরের ঘরে ঢুকে বকুল একবার আমার দিকে কেন যেন তাকায়। একটু হাসে। তারপর দেয়ালে আলমারির দিকে দৌড়ে যায়। বই খাতাপত্র হাতড়াতে থাকে। আমি ঘর দেখি। কোণার দিকে একটা বিশাল খাট। তার ওপর পুরু বিছানা। চাদরটা সাধারণ তাঁতের, কিন্তু পরিষ্কার। তার ফিকে নীল বুকে অগাধ আরাম অপেক্ষা করছে। একটু ইতস্তত করে সটান শুয়ে পড়ি। মুখ দিয়ে বিস্ফোরণের মতো বেরিয়ে আসে—শোভানাল্লা।

বকুল ঘুরে একবার দেখে নেয়। ঠোঁটে সেই সুন্দর হাসি। সে

আবার খাতা হাতড়াতে থাকে। জানিনা কী দেখাতে চায় আমাকে।

শুয়ে শুয়ে দেয়ালগুলো দেখি। মুসলিম তীর্থগুলোর ছবি, আরবি হরফে লেখা ঐশ্বরিক বাক্য—এই সব। ইকবালদের বাড়িতে এসব দেখা আছে। হঠাৎ একটা কোণের দিকে চোখ যায়। বুক অব্দি একটি কিশোরের ফটো। বেশ বড়ো। সুন্দর। দুটো চোখ তীক্ষ্ণ, উজ্জ্বল, গভীর। মাথায় এলোমেলো চুল। আমার হৃদপিণ্ড ধক্ করে নড়ে ওঠে। তারপর সম্মোহিত হয়ে যাই। ওই কি সেই মুকুল? তা যদি হয়, আমিও কি ওর মতো সুন্দর? বিশ্বাস হয় না। ছেলেটাকে নিষ্পাপ আর সরল দেখাচ্ছে। ও আমার মতো হত্যাকারী নয়। রক্ত কী ও জানে না। রক্তের স্বাদ ও পায়নি। আমার রাগ হতে থাকে। ঈর্ষায় অভিমানে বুকের ভিতর আগুন ধরে যায়। ওকে জঘন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বীর মতো মনে হতে থাকে। বকুল ও ঘরে এখন না থাকলে ওর ছবিটা ভেঙে ফেলতুম!

—মুকুল! বকুল একটা খাতা খুলেই চেঁচিয়ে ওঠে। তারপর —তারপর বিছানার কাছে এসে বলে—বল্ তো, এগুলো কী?

একটু চমকে উঠি। ওর কি সন্দেহ হয়েছে, তাই আমাকে পরীক্ষা করতে এঘরে নিয়ে এল? আমি অস্বস্তিতে দুলে উঠি এবং ওর খাতাটার দিকে তাকাই।

পরক্ষণেই হেসে উঠি।—সেই পাতাগুলো! সেই প্রজাপতিটা!

বকুলের চোখে চাপা উত্তেজনা ছিল। তার শ্বাসপ্রশ্বাসের চাঞ্চল্য টের পেতে থাকি। সে বলে—হুঁ, সেই পাতাগুলো! সেই প্রজাপতিটা!

কাগজের ওপর খুব যত্ন করে চিরোল-চিরোল দুটো পাতা আর প্রজাপতির দুটো ডানা আঁটা রয়েছে। সরল প্রকৃতি বিজ্ঞান পড়ার সময় মাস্টার মশাইরা সব শেখান। আস্তে বলি—পাতা দুটোর রঙ একটু ফিকে হয়েছে। কিন্তু প্রজাপতির ডানার রঙ তেমনি আছে।

বকুল বলে—এগুলো তোর মনে পড়ত না, মুকুল ?

—পড়ত।

সে খাতার আরেকটা পাতা ওল্টাতে গিয়ে আঙুলের ফাঁকে রেখে দেয় এবং বলে—পরের পাতায় কী আছে বল তো ?

হাল ছেড়ে দিয়ে বলি—উঁহু, মনে নেই।

বকুল জোর দিয়ে বলে—প্রজাপতির কথা মনে থাকলে এও মনে থাকবে।

—কিছু মনে পড়ছে না রে !

—ভেবে ছাখ।

—দেখলুম।

বকুল আমার দিকে কেমন চোখে তাকিয়ে বলে—কেন মনে পড়ছেনা তোর ?

—জানি না।

বকুল দুঃখিত হয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। তারপর পাতাটা মেলে ধরে। তাকিয়ে থাকি। পাতায় কালচে লাল কয়েকটা ছোপ, বেলপচা তুলির টানের মতো। সেগুলো ঘিরে পেন্সিলের বর্ডার। খুব অদ্ভুত লাগে। কী হতে পারে এগুলো ? ছবি তো নয়ই।

বকুলের শ্বাসপ্রশ্বাস ঘন হয়ে উঠছে টের পাই। সে মাঝে মাঝে শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ করে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার মুখ দেখতে থাকে। অপ্রস্তুত হয়ে থাকি। বুকের তলায় চাপা কাঁপুনি চলতে থাকে।

তারপর কী একটা ঘটে যায় আমার মধ্যে। অন্ধকার জঙ্গলের মধ্যে কোথাও একটা শিকারী জানোয়ার চঞ্চল হয়। তার নাকে চেনা গন্ধের ঝাঁঝ এসে লাগে। সে গরগর করে ওঠে। তার জিভ বেরিয়ে পড়ে। দাঁতগুলো ঝলসে ওঠে।

প্রচণ্ড একটা হুঙ্কার চাপা দিতে খুব কষ্ট হয় আমার। অস্ফুট স্বরে বলে উঠি—রক্ত ! এ কার রক্ত বকুল ?

বকুল মাথাটা একটু দোলায় শুধু। তারপর দেখি, ওর চোখে

জল ছলছল করছে। ঘন পাপড়িগুলো জলের চাপে থরথর করে কাঁপছে।

—বকুল! বকুল!

সে মুখটা ঘুরিয়ে বলে—প্রজাপতিটা নিয়ে তোর সঙ্গে আমার খুব ঝগড়া হয়েছিল।

—হয়েছিল।

—মা তোকে তাড়া করলেন।

—হ্যাঁ, মা খুব···

—মা খুব রেগে গিয়েছিলেন। তখন তুই একটা ইটের টুকরো ছুঁড়ে মারলি। মায়ের মাথায় লাগল। রক্ত পড়ছিল। মা পড়ে গেলেন।

—তারপর মা···

—তারপর মায়ের জ্বর এসে গেল! জ্বরের ঘোরে ভুল বকছিলেন। তুই তখন পালিয়ে গেছিস। রাত দশটায় মায়ের শরীর ধনুকের মতো···

—ধনুস্টংকার হয়েছিল!

—ভোর রাতে মা মারা গেলেন।

আমার শরীর কাঠ হয়ে যায়। মড়ার মত পড়ে থাকি। মুকুলের ছবিটা দেখি।

বকুল বলে—এ্যাদ্দিন পরে ফিরে এলি। তুই এলে তোকে মায়ের রক্ত দেখাব বলে রক্তমাখা তুলো থেকে এগুলো রেখে দিয়েছিলুম।

হঠাৎ থেমে সে কেঁদে ওঠে। আমার পাশেই বিছানায় মুখ গুঁজে দেয় এবং তার পিঠ ফুলে-ফুলে ওঠে। কতক্ষণ পরে আমি আস্তে আস্তে উঠে বসি। তার পিঠে হাত রাখি।—বকুল!

তার কান্না থামে। কিন্তু ওভাবেই সে পড়ে থাকে।

আবার ডাকি—বকুল!

তখন সে ওঠে। চোখ মুছে বলে—আসছি।

আমি বাধা দেবার আগেই সে প্রায় দৌড়ে বেরিয়ে যায়। বিছানায় পড়ে থাকি। খাতাটা বুজিয়ে দিই। হাত কাঁপে। আবার এক অজানা ভয়ে বুক ঢিপ ঢিপ করে। আমি তাহলে আমারই নিজস্ব রক্তের ভূমিকায় এখনও স্থিত আছি?

কিন্তু এক মাতৃহত্যার ভূমিকায়!

বুঝতে পারছি, চৌধুরী পরিবার এই আকস্মিক হত্যাকাণ্ড সাবধানে সামলে নিয়েছিল। রটিয়েছিল, টাকাকড়ি নিয়ে মুকুল পালিয়ে গেছে। কোথায় আছে সে? পরশুরামের মতো সেই কিশোর খুনী কি এখনও তীর্থে তীর্থে পাপস্খলনের জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করে বেড়াচ্ছে?

রাগ দুঃখ অভিমান আর হিংসা ক্রমশ আমাকে ক্ষেপাতে থাকে! যে শান্তি চাইছিলুম, তা আমার ভাগ্যে নেই। উঠে গিয়ে মুকুলের ছবির সামনে দাঁড়াই। তার সঙ্গে মনে-মনে কথা বলতে তৈরী হই। কিন্তু তার আগেই সে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বলে—তুমি কে?

—চিনতে পারছ না?

—হুঁ, পেরেছি।

—কিন্তু আমি তোমার মতো মাতৃহত্যা নই।

—হতে পারে। কিন্তু তুমিও পারতে!

—পারতুম?

—নিশ্চয় পারতে। তোমার রক্ত আমার রক্ত এক।

—হয়তো তাই।

—হয়তো নয়, ঠিক তাই।

—কিন্তু কেন?

—আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি, কেন'র জবাব পেতে

—আমিও তো খুঁজতে বেরিয়েছি।

—তাহলে এখানে নয়। অন্য কোথাও যাও।

—যাব। কিন্তু শোন, তোমায় আমি ঘৃণা করি।

—তোমাকেও আমি ঘৃণা করি।

দুই প্রতিদ্বন্দ্বী ঘৃণার চোখ নিয়ে পরস্পরকে দেখতে থাকে। তারপর বকুল ফিরে আসে। সে একটু থমকে দাঁড়ায়। তারপর বলে, খাবি আয়।

খিদে মুহূর্তে জেগে ওঠে। সব ভুলে যাই—ঘৃণা বা অস্বস্তি। বকুল আরও একটু এগিয়ে চাপা গলায় বলে, আমার সামনে মায়ের কথা তুলিবিনে। কেমন?

ঘাড় নাড়ি।—পাগল?

—আব্বা তুলবেন না, জানি। কিন্তু ভুলেও তুই কখনো···

—না, বকুল। না।

হঠাৎ সে আমার কপালে আঙুল ছুঁইয়ে বলে ওঠে—দাগটা কিসের রে?

একটু হেসে বলি—পড়ে গিয়ে চোট লেগেছিল।

—মনে নেই। তুই ভীষণ দুষ্টু ছিলি—শুধু এটুকুই মনে পড়েছে।

ওকে আমি শার্টের হাতা সরিয়ে আরও কয়েকটা দাগ দেখাতেই ও চমকে ওঠে। বলি—এখান থেকে চলে গিয়ে কত কী ঘটেছিল।

আবেগ আমাকে বিহ্বল করে। বকুলকে সারা শরীরের ক্ষতচিহ্নগুলো দেখাতে ইচ্ছে করে। অন্ধ সেই আবেগ আমাকে পাগলের মতো যা খুশি করতে নাড়া দেয়। বকুল শিউরে উঠে বলে—ইস! ইস!

দ্রুত জামা খুলে ফেলি। বকুল আকুল আমার বুক পিঠ পাঁজরে আঙুল ছুঁইয়ে অস্ফুটে বলে—ইস! তারপর সে ছলছল চোখে তাকায় আমার দিকে।—তুই খুব মার খেয়েছিস! কেন রে? কে তোকে মেরেছিল? মুকুল? পুলিশ?

একটু হাসি। শুধু বলি—প্রায়শ্চিত্ত।

—কিন্তু তুই তো ইচ্ছে করে মাকে ইঁট ছুড়িস নি। ও তোর অভ্যাস!

—না রে!

—ছিঃ মুকুল।

—বকুল, আমাকে তুই মাফ করেছিস?

—করেছি। আব্বাও করেছেন। কাকা বলেন, মুকুল তো দায়ী নয়। আজরাইল (মৃত্যুর দেবদূত) ওর হাত দিয়ে কাজটা করেছেন। আব্বা বলেন, আজরাইল কত রূপ ধরে ঘুরে বেড়ান। সেদিন তোর রূপ ধরে এসেছিলেন। তখন তুই হয়তো অন্য কোথাও ছিল।

—তুই বিশ্বাস করিস একথা?

—করি।

মন ভরে যায় ওর কথায়। ননীদা, আমি খুন করিনি। আমার চেহারা দখল করেছিল চিরকালের ঘাতক সেই দেবদূত। ননীদা, শুনতে পাচ্ছ তো? আমার এক বোন সাক্ষী। আমার এক বাবাও সাক্ষী। ওর কাঁধে হাত রেখে বলি, বকুল! তুই আমার সত্যিকারের বোন।

একটু হাসে; আঠারো উনিশ বছরের সরলমনা যুবতী। বলে—সতিকার মানে?

—কিছু না। চল, ক্ষিদে পেয়েছে।

জামাটা পরে নিয়ে সোয়েটার চাপিয়ে যেতে যেতে দেয়াল খুঁজে বলি—আচ্ছা বকুল, মায়ের ফোটো নেই কেন রে?

বকুল জবাব দেয়—মা ছবি তুলতে চাইতেন না। বলতেন, গোনা (পাপ) হবে।

—কেন?

—বা রে! মুসলমানদের কাছে ছবি হারাম (নিষিদ্ধ) যে!

—তাই বুঝি?

—মনে হচ্ছে, তুই হিন্দুদের মধ্যে এতকাল ছিলি। সব ভুলে গেছিস।

—ঠিক বলেছিস রে!

—রাত্তিরে সব শুনতে চাইবেন আব্বা।

—বলব'খন। কিন্তু মায়ের ছবি থাকলে···

হঠাৎ থামতে দেখে বকুল বলে—মায়ের কথা আর নয়। চল্ আব্বা তোর জন্য অপেক্ষা করছেন।

নীচে গিয়ে দেখি অন্ধ বৃদ্ধ বারান্দার তক্তাপোষে বসে আছেন। পাশেই নক্সাকাটা সাদা কাপড় বিছানো। তার ওপর অনেকগুলো খাবারের প্লেট। ইকবালের বাড়ি গিয়ে এগুলোর কিছু কিছু আমার চেনা হয়ে আছে। আমাদের সাড়া পেয়ে বলেন—পরে গোসল (চান) করবি'খন। কোথায় খেয়েছিস, ঠিক নেই। আগে নাস্তা (জলখাবার) খেয়ে নে।

—আব্বা, আপনিও খাবেন তো?

অন্ধ হাত নাড়েন—না রে। আমার হরেক বেমারি। বেছে খেতে হয়। আমি বসে থাকছি। তুই খা।

—বকুল, আয়।

বকুল মাথা দোলায়।—উঁহু। আমার খাওয়া হয়ে গেছে যে।

—মোটেও না। তুই না খেলে খাব না।

বৃদ্ধ হেসে ওঠেন।—সেই স্বভাব! ভাইবোনে সবসময় মারামারি। অথচ খাবার সময় কাছাকাছি না থাকলে কেউ মুখে তুলবে না।

—কিন্তু আব্বা, এ্যাদ্দিন বকুল একলা খেয়েছে।

বৃদ্ধ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন—ওকি খাওয়া বাবা? নেহাত জান বাঁচনো। চোখে দেখি না—তবু বুঝি, বকুল আগের চেয়ে কত রোগা হয়ে গেছে।

বকুল বলে—ও কি রে? হাত-পা ধোওয়া নেই, খেতে বসছিস যে?

বৃদ্ধ হাসেন আবার।—সেই স্বভাব! বাইরে থেকে এসেই হাত মুখ না ধুয়ে খেতে বসত। সে নিয়ে কত হত!

অপ্রস্তুত হয়ে বলি—কিন্তু…আমার যে আর কাপড়-চোপড় নেই সঙ্গে!

বকুল হাসে।—ব্যবস্থা হচ্ছে'খন। অন্ততঃ হাত-পাটা ধুয়ে খেয়ে তো নে। তারপর…

চৌধুরীসাহেব বলেন—মকবুল দরজীকে খবর পাঠিয়েছি। ঝটপট পাজামা-টামা বানিয়ে দেবে। ততক্ষণ আমার পাজামা-পাঞ্জাবি পরুক। ফিট করবে না বকুল?

বকুল আড়চোখে আমার শরীর মেপে নিয়ে বলে—করতে পারে।

আমি জোরে মাথা নেড়ে বলি—মোটেও না। আব্বা আমার ডবল।

চৌধুরীসায়েব বলেন—বয়সকালে তুইও হবি, বাবা। আমাদের খানদানি বংশ। গায়ের রঙ, হাত-পায়ের ছড়ানো গড়ন, তোমার গিয়ে, নাক—সব দেখলেই বোঝা যায় এরা কারা।

বকুল সরল হেসে বলে—মুকুলকে দেখে তা কিন্তু মনে হবে না আব্বা। ওর গায়ের রঙ পুড়ে তোমার মতো হয়ে গেছে! নাকটাও খ্যাঁদা হয়ে গেছে।

কপট রাগ দেখিয়ে বলি—তোমার চেয়ে সুন্দর!

বুড়ি ময়ামুন চাকরাণী থামের ওপাশ থেকে বলে ওঠে—ভাইজান তখন বালক বয়েসে দেখতে ছিল বাদশাজাদা! আহা, দেশে দেশে ঘুরে সে রূপ কী করেছে গো!

অন্ধ বৃদ্ধ বলেন—আবার সব ঠিক হয়ে যাবে।

আমি বালতির জলে বাঁ পা যেই ধুয়েছি, বকুল খিলখিল করে হেসে উঠেছে।—আব্বা! আব্বা! তোমার খোকামিয়া হিন্দুবাড়ি কাটিয়েছে!

বৃদ্ধ বলেন—কেন, কেন ?

—আগে বাঁ পা ধুচ্ছে।

বৃদ্ধ হেসে বলেন—হিন্দুরা কি আগে বাঁ পা ধোয় ?

—নিশ্চয় ধোয়। তা না হলে ও ধুচ্ছে কেন ?

আমি চোখ পাকিয়ে বলি—থামো, থামো! তোমার জন্যে হিন্দু বর ঠিক করে রেখে এসেছি!

অন্ধ হো হো করে হেসে ওঠেন! বুড়ী ঝি প্রচণ্ড হাসে। বকুল রাঙা মুখে বলে তুই হিন্দু মেয়ে বিয়ে করিস, তাহলেই হবে!

—নাঃ। আমি মুসলমান মেয়ে বিয়ে করব।

চৌধুরীসায়েব হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলেন—তোর মা বাঁচলে এ্যাদ্দিনে কবে তা হত। তোর কনে ঠিক করাই তো ছিল। এখনও আছে। খোন্দকারের মেয়ের বিয়ে এখনও হয় নি। স্কুলে মাস্টারি করছে। গরীব হয়ে গেছে কিনা।

বকুল বলে—না। আমি থাকতে তো না।

—কেনরে বকুল ? আমিই জিগ্যেস করলুম।

বৃদ্ধও বলেন—কেন, কেন ?

—রিজিয়ার সঙ্গে মুকুলের বিয়ে হবে না। ব্যস!

—আহা, কেন ? খোন্দকার তো পয়সার অভাবে বিয়ে দিতেই পারল না। তোর মায়ের সইয়ের মেয়ে। তোর মায়ের কথা মানলে তাঁর রুহ্ (আত্মা) শান্তি পাবে।

বকুল বলে—ও কথা থাক।

আমি ডাকি ওকে।—কই, আয়। খাওয়া যাক।

বকুল বসে পড়ে। একচামচ সেমাই তুলে আস্তে মুখে পোরে। আমি প্রায় গোগ্রাসে গিলতে থাকি। আমরে খাওয়া দেখে ও যেভাবে চাপা হাসে, বুঝতে পারি, ওর সত্যিকার ভাইজানটি ঠিক এভাবেই খেত।...

খাওয়া শেষ করে আমি বলি—এবার আমি কিছুক্ষণ সাউণ্ড স্লিপ দিয়ে নেব। কেউ যেন ডিসটার্ব না করে।

অন্ধ বলেন—বেশ তো। দরজায় খিল এঁটে ঘুমোবে।

বকুল ওঁর ঘর থেকে পাজামা পাঞ্জাবি এনে বলে—ওপরে চল্

আবার সিঁড়ি বেয়ে দুজনে ওপরের সেই ঘরে আসি। তারপর জামা খুলে ফেলি। বকুল দ্রুত আমার ক্ষতবিক্ষত শরীরটা দেখে নেয়। আবার ওর মুখে কিসের ছায়া পড়ে। তারপর বলে—আসছি, এখনই দরজা বন্ধ করিসনে।

প্রকাণ্ড পাজামা পাঞ্জাবি পরে শুয়ে সিগ্রেট জ্বালি। আরামে টানতে থাকি। এই একটা দিন—তারপর রাত—তারপর আমি এখান থেকে চলে যাব চলে যেতেই হবে। একজন কোন রকমে ম্যানেজ করে গেলুম। এরপর ক্রমশঃ আরও সতর্ক হতে হবে। ধরা পড়ে যাবই—তাতে কোন ভুল নেই।

অথচ আমার ভিতরে লোভ হাহাকার করছে। আঃ। কত দুঃখের পর পারিবারিক স্নেহ-প্রীতি-আদর ফিরে পেলুম। এসব ছেড়ে চলে যেতে হবে ভাবলেই কষ্ট হচ্ছে। আর, আমার প্রাণের মতো ঘনিষ্ঠ একটি সত্তা ওই বকুল—আমার বোন! এই প্রথম এক যুবতী মেয়েকে আমি বোনের মতো সম্মানিত স্নেহ দিতে পারছি! তার শরীরের কথা ভুলেই তাকে দেখতে পারছি। সবটুকু রক্ত দিয়েও এই সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে।

বকুল এসেই পাশে বিছানায় বসে পড়ল।—ঘুম এলে ঘুমো। দরজা আমি বাইরে থেকে আটকে দেব।

তারপর হঠাৎ চমকে উঠে বলল—ও কী রে! তুই কাঁদছিস?

না-না।

সি / ছয়

ইচ্ছে করছিল এই নিষ্পাপ মেয়েটিকে এখনই সব সত্যিকার কথা জানিয়ে দিই। কিন্তু তার ফলে ঠিক কী ঘটবে জানি না। এতদিন ধরে তো একটা মিথ্যে পরিচিতি বয়ে বেড়াচ্ছি—সেই পরিচিতির বস্তায় ভরা আছে বিপ্লব নামে একটা লাস—একটা ব্যর্থ বুলেটবিদ্ধ শরীর এবং যা মৃতদের অন্তর্গত।

কিন্তু কোন্ আমি-টার পরিচয় দেব ওর কাছে? পুলিশের তালিকায় লেখা এগারো নম্বর লাসটার, নাকি অনিন্দ্য গুপ্ত ওরফে বাণ্ডিলের?

বকুলের চোখের দিকে তাকিয়ে ভাবতে থাকি, আর সেই তীব্র ভাবনা মগজ ঘামিয়ে দুই চোখে ঠিকরে বেরোতে থাকে। ঘামকিংবা জল—বকুল তাকে ধরে নেয় কান্নার ফোঁটা। বোকা মেয়ে, এ জল কান্নাকাটি নয়। ভেতরে টগবগ করে হৃদয় মজ্জা মগজ ফুটছে—টের পাচ্ছিস না তুই?

অগত্যা হাল ছেড়ে দিই। বুঝতে পারি না আমার কোন্ পরিচয় যথার্থ। বিপ্লবের লাস থেকে শুকনো শেকড়চ্যুত বৃক্ষকাণ্ডে উদ্ভট আঁকুর গজামোর মতো অনিন্দ্য ওরফে বাণ্ডিলের আবির্ভাব, তারপর একটা গুরুতর আত্মহত্যা ঘটেছে এবং আমার পুরাণোক্ত রক্তবীজের মতে মুকুল বেরিয়ে এসেছে। যেভাবে একদিন অভ্যাসে নিজের বাণ্ডিল সত্য হয়ে উঠেছিল, এরপর ঠিক সেভাবেই নিরন্তর অভ্যাসে মুকুলকে কি সত্য করা যাবে না?

বেঁচে থাকার সেই প্রাকৃতিক আদিমতর প্রবৃত্তি আমার ভাবনায় মধ্যে জলন্ত মোমবাতির কেন্দ্রে হিম নীল অংশটুকুর মতো দেখা যেতে থাকে।

মাথাটা একটু তুলিয়ে ওকে বলি –কাঁদিনি। তুই কী বোকা রে! একে কান্না ভেবে বসলি? সারা রাত জেগেছি ট্রেনে। চোখ জ্বাল' করছে।

বকুল আশ্বস্ত হয়। ওর ঠোঁটে একটু হাসি ঝিকমিক করে ওঠে।

—তাহলে তুই ঘুমো। ওবেলা বলব'খন।

—কী বলবি রে?

—ফের কথা বলে! তুই ঘুমো।

—না। তুই কী বলবি, বল। শুনতে শুনতে যদি ঘুম আসে।

বকুল একটু চুপ করে থাকার পর খুব আস্তে বলে—তুই কোথায় ছিলি, কী করতিস, সব জানতে ইচ্ছে করে। আর···

—আর কী রে?

—আমার জন্যে মন কেমন নাই করল, রিজুর জন্যে?

বকুলের মুখে দুষ্টুমি ফুটে ওঠে। আমিও সেই দুষ্টুমি ধার নিয়ে বলি—রিজুর জন্যে মন কেমন করবে কী! ও তো বড্ড পাজি মেয়ে ছিল!

—ছিল। ফ্রক-পরা বয়সেই পেকে লাল হয়ে গিছল।···বলে বকুল ফিসফিস করে ওঠে—মইনুল কাজীর ছেলে সানু, বুঝলি? এখন কলকাতায় ডাক্তারী পড়ছে। মাঝে মাঝে আসে। রিজুর সঙ্গে ওর সেই কবে থেকে ভাব, জানিস? সানু এলেই বেহায়ার মতো ওদের বাড়ি গিয়ে বসে থাকে। এ নিয়ে গাঁয়ে কত কেলেঙ্কারি। স্কুলের চাকরি একবার যেতেই বসেছিল।

—বলিস কী!

—তাই তো আব্বাকে বললুম, রিজুর সঙ্গে মুকুলের বিয়ে হতেই পারে না।

—বকুল! তোর মতো শুভাকাঙ্ক্ষিনী এ্যাদ্দিন পেলে সব বদলে যেত!

বকুল এই সায় পেয়ে আরও সিরিয়াস হয়ে বলে—এখন তুই ফিরেছিস তো। এবার দেখবি, খোন্দকার ঘনঘন আব্বার কাছে আসবেন। কিন্তু খবর্দার, তুই মত দিবি নে।

বকুলকে চুপ করে থাকতে দেখে বলি—রিজুর কথা আরও জানতে ইচ্ছে করছে রে!

বকুলের চোখে ভৎর্সনা মেশানো বিস্ময় ফুটে ওঠে। বলে—ভ্যাট! ওর নাম করলে দেখবি, দিন ভাল যাবে না। আব্বা বলছেন বটে, মা এখন বেঁচে থাকলে কিছুতেই আর বিয়েতে মত দিতেন না। কথা দিয়েছিলেন বলে মাথা কিনেছে নাকি ওরা? মায়ের বড় আপত্তি হত কোন্‌খানে জানিস? রিজু পর্দা মানে না। টো টো করে ঘুরে বেড়ায়। পুরুষ মানুষদের সঙ্গে হেসে-হেসে কথা বলে। সবচেয়ে খারাপ কথা—রিজু নমাজ পড়তে জানে না। কোরাণ পড়তে পারে না!

বকুল এত দ্রুত কথাগুলো বলে প্রায় হাঁফিয়ে পড়ে। উত্তেজনায় ওর মুখ লাল হয়ে ওঠে। হাসি চেপে বলি—তুই নমাজ পড়তে পারিস তো? কোরাণ পড়িস?

বকুল সগর্বে বলে—হুঁউ। মুসলমানের মেয়ে—জানতে হবে না ওসব? জানিস, আমি অর্ধেক কোরাণ মুখস্থ বলতে পারি!

—বাঃ! তুই তাহলে বড় ধার্মিক রে!

বকুল সলজ্জ হেসে বলে—এখনও তোর সেই জাহেলীপনা কাটেনি!

—জাহেলীপনা কী রে বকুল?

—তুই হিন্দুদের পাল্লায় পড়ে সব ভুলে গেছিস দেখছি। জাহেল কাকে বলে জানিস নে? পাষণ্ড মূর্খ নাস্তিককে।

ওর মুখে কাকাতুয়ার মতো শেখানো বুলির আভাষ পেয়ে বলি—তাহলে আমার উদ্ধার কিসে হবে বল্‌তো?

—ইমামসায়েব রোজ সন্ধ্যেবেলা আমাকে হাদিস পড়াতে আসেন। তুইও পড়িস।

—হাদিস মানে ?

বকুল একটু রাগ করে বলে—শরীয়তের কেতাব।

—শরীয়ত মানে ?

এবার বকুল হেসে ফেলে।—একটুও বদলাস্ নি। জমবে ভাল ; তোকে আবার হাতে ধরে ইসলামী কায়দাকানুন শেখাতে হবে। আমরা খানদানি ঘরের লোক যে! খেতে-শুতে চলতে-ফিরতে কতরকম আদব কায়দা মানতে হয়। ইলামসায়েব আমাকে শিখিয়েছেন।

—বকুল, তুই কেমন করে নমাজ পড়িস আমাকে দেখাবি ?

হুঁউ।···বলে বকুল হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে ওঠে। জানলার দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবতে থাকে।

—বকুল !

—উঁ।

—কী ভাবছিস ?

নমাজ পড়লে কী হয়। হাতে-নাতে তার ফল পেলুম দেখলি তো ?

—কী ফল রে ?

—তুই ফিরে এলি।

—নমাজের সময় তুই বুঝি তাই প্রার্থনা করতিস ?

বকুল আস্তে মাথাটা দোলায়। ওর মুখে যেন কী জ্যোতি খেলে। শিউরে উঠি। ওকে এ মুহূর্তে কত সুদূর আর উজ্জ্বল দেখায় কেন ? মানুষের মুখে এই যে আশ্চর্য ছটা দেখছি, তা কিসের ?

হয়তো বিশ্বাসের। বিশ্বাস—যে-কোন একটা বিশ্বাস মানুষকে

যেন জীবনের কোন-না-কোন ব্যাখ্যা দেয়, সরলার্থ বোঝায়। বকুলের একটা বিশ্বাস আছে। আমার নেই।

এবং ওর বিশ্বাস, আমি তো জানছি যে ওকে বোকা পেয়ে ঠকাচ্ছে। ওর সেই নিরুদ্দিষ্ট ভাইটি সত্যি সত্যি ফিরে আসে নি। মানুষের বিশ্বাসের পিছনে এমনি কত রকম নির্বুদ্ধিতা কাজ করে, সংখ্যা নেই। যেমন, আমাকেও তো বলা হয়েছিল—বিপ্লব, এই পথে চলো। বিপ্লব আসবে। বিপ্লব, সমাজকে বদলে দেওয়াটা জরুরী। অতএব বদলে দেওয়ার কাজে হাত লাগাও। হাত লাগাতে গিয়ে আমার লাস এতটা তকমা পেল : এগারো নম্বর !

নিরুদ্দিষ্ট এগারো নম্বর বিশ্বাসের গায়ে শীলমোহর আঁটা। শোভানাল্লা !

বকুল চমকে উঠল—কি হল ?

—কিছু না। অভ্যাস।

—শোভানাল্লা বলছিস যে ? হিন্দুরা রাগ করত না ? যদি ধরা পড়ে যেতিস ?

—বকুল, আমি ধরা পড়ি না। কারও সাধ্য নে ধরে।

—ইস্! থাম্। আর বড়াই করতে হবে না।

—বকুল, যদি তোকে বলি, তুই—তোরা সবাই ভুল করছিস্। আমি মুকুল নই—অন্য কেউ হই যদি ?

বকুল আবার চমকে উঠল। আমার মুখের দিকে নিষ্পলক তাকাল! ওর মুখে একটা অসহায় মানুষের ভাব ফুটে উঠল। তারপর সে জোরে মাথাটা দোলাল।

—বকুল, যদি সত্যি আমি তোর ভাই মুকুল না হই ?

বকুলের চোখ ছলছল করে। সে শুধু মাথা দোলায়।

—তাহলে আমাকে তাড়িয়ে দিবি ? ঘৃণা করবি ? নাকি পুলিশে ধরিয়ে দিবি ?

বকুল আমার মুখে হাত রাখে! ওর হাতের চাপে টের পাই, ও

ছটফট করছে। গাছ কেটে ফেলার সময় ডালপালা আর পাতায় যে রকম থরথর কাঁপন জেগে ওঠে, সেই কাঁপন। তারপর সে আমার মুখ থেকে হাত তুলে নেয়। নিজের দুই চোখ ঢাকে। ঘুরে বসে হু হু করে কেঁদে ওঠে। ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদে। কান্নার মধ্যে বারবার জড়ানো স্বরে বলে—না, না না!

তখনকার মতো সান্ত্বনা দিতে হাত বাড়াই নে। একটা নিষ্ঠুরতা জেগে ওঠে আমার মধ্যে। যে ঈশ্বর এবং বিশ্বাস ওর পা রাখার জায়গা, সেখানটা নড়িয়ে দেবার সুখে আমি সুখী এখন। নির্বিকার ভাবে তাকিয়ে ওর কান্না দেখি।

কতক্ষণ পরে সে শান্ত হয়। আঁচলে চোখ মোছে। তারপর ঘুরে বলে, তুই এখনও সবাইকে কাঁদাতে ভালবাসিস। একটুও বদলাস নি।

এবার বিছানায় উঠে ওর চোখে চোখ রেখে বলি—বোকা, বকুল! তুই বড় বোকা! কেমন করে চিনলি আমি তোর ভাই মুকুল?

বকুল আমার চোখের দিকে তাকাতে পারল না। নিজেই টের পাচ্ছি, আমার চোখে কী রয়েছে। ও মুখ নামিয়ে নিজের আঙুল দেখতে দেখতে বলল—তুই মায়ের রক্ত দেখেই চিনে ফেললি। এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর হয় না। বল্‌, হয় নাকি?

—এমনও হতে পারে, আমি রক্ত দেখে চিনতে পারি। রক্ত আর রঙের মধ্যে তফাৎ বুঝতে পারি—এইটুকুই!

বকুল কী জবাব দিতে যাচ্ছে, সেই ঝি বুড়ী দরজায় উঁকি মেরে বলল—বকুল, কাজীসায়েব এয়েছেন খোকামিয়াকে দেখতে। নীচে যাবে, নাকি ওনাকে আসতে বলব?

বকুল মুহূর্তে স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। বলে—বলে দাও, এখন দেখা হবে না। রাত জেগে এসেছে। ঘুমোচ্ছে। ওবেলা আসবেন।

বুড়ী অদৃশ্য হলে বলি—কাজী সায়েবটা কে রে ?

—কেন ? শানুর বাবা।…বলে বকুল একটু হাসে। মুখে লজ্জার রঙ ফোটে। সে অন্যদিকে ঘুরে বলে—আব্বার বুড়ো হয়েও বটে, আবার চোখ হারিয়েও বটে—বুদ্ধিসুদ্ধি গুলিয়ে গেছে। কী কাণ্ড করেছেন তলায়-তলায় শুনলে অবাক হবি। শানুর সঙ্গে আমার…

কথা কেড়ে বলি—বিয়ে লাগিয়েছেন, এই তো ?

বকুল আরও রাঙা হয়ে বলে—যাঃ !

—এতক্ষণ বলতে হয় ! শোভানাল্লা !

বকুল রাগ দেখিয়ে বলে—কাজীসায়েব কী ভেবে বিয়ে দিতে চেয়েছিল জানিস না, তাই লাফাচ্ছিস। জানলে তুইও রেগে যাবি।

—কী ভেবে ?

—সোজা হিসেব। চৌধুরীসাহেবের একমাত্র মেয়ে। ছেলের তো পাত্তা নেই। যা কিছু সম্পত্তি, সব ওরাই পেয়ে যাবে। নইলে ডাক্তারী পড়া-ছেলের সঙ্গে আমার মতো স্কুল ফাইনাল পাশ মেয়ের বিয়ে দিতে চাইত ভাবছিস ? শানু তো রিজুকেই বিয়ে করতে চেয়েছিল। কাজীসায়েব রাজী হয় নি। ভীষণ স্বার্থপর লোক যে ! খোন্দকার মাথা ভাঙলেও একটা কানাকড়ি দিতে পারবে না।

—তাহলে আমি তো এখন ফিরে এসেছি, কাজীসায়েব কী করেন দেখা যাক্, কী বলিস ?

বকুল সায় দিয়ে হাসতে হাসতে বলে—এবার দেখা যাবে।

—কিন্তু তোর তো ভালই হত, আমি না ফিরলে। ডাক্তার বর পেতিস !

বকুল আবার রেগে ওঠে।—ডাক্তার না ফাক্তার ! ও তো রিজুকে চিঠি লেখে। জেনেশুনে আমি বিষ খাব নাকি ?

—আব্বা রাজী হলে তুই কী করবি ?

—আমি এজিনই দেব না।

—এজিন মানে ?

বকুল আমার অজ্ঞতা দেখে হতভম্ব হয়ে বলে—তোর কিছু হবে না। নিজের ধর্মটাকেই ভুলেছিস! এজিন মানে, যখন বিয়ের মজলিশ বসবে—বরের কাছ থেকে বিয়ের মত নিয়ে একজন উকিল আর তুজন সাক্ষী অন্দর মহলে কনের কাছে যাবে। গিয়ে বলবে—অমুকের ছেলে তোমাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে, তুমি তাকে বিয়ে করতে রাজী তো ? কনে পর্দার আড়াল থেকে বলবে—রাজী। উঁহু, কথাটা হল—মঞ্জুর। কনে বলবে—মঞ্জুর। উকিল বলবে—তিনবার জোরে বলো। কনেকে তিনবার বলতে হবে—মঞ্জুর! তখন উকিল সাক্ষী তুজনকে বলবে—শুনলে তো ? ওরা বলবে—শুনলুম। তারপর ওরা তিনজনে বরের কাছে যাবে। মজলিশের সবাইকে শুনিয়ে বলবে—অমুকের মেয়ে অমুকের ছেলেকে বিয়ে করতে রাজী আছে। তখন যিনি বিয়ে পড়াবেন, সেই ইমামসায়েব সাক্ষী তুজনকে জিগ্যেস করবেন—আপনারা শুনেছেন ?…জী

হ্যাঁ।…নিজের কানে শুনেছেন ?…জী হাঁ। ব্যস, আবার কী! তখন দোয়াদরুদ পড়ে…

কথা কেড়ে বলি—পর্দার আড়াল থেকে! কোন মানে হয় না। ধর, তুই রাজী নোস—অন্য কেউ বলে দিল তোর হয়ে। তখন ?

বকুল বলে—যাঃ! তাই বলে নাকি কেউ!

—বলতেও তো পারে।

—তুই বুঝছিস না। তখন রাজী না হয়ে বা মঞ্জুর না বলে রেহাই আছে নাকি! চারপাশ থেকে মেয়েদের গুঁতোর চোটে অস্থির। বলতেই হবে। সেবার রোশেনারার বিয়েতে কী কাণ্ড হয়েছিল শোন্। ও তো কিছুতেই মঞ্জুর বলবে না। তার মানে

এজিন বা সম্মতি দেবে না। তখন মেয়েরা ওকে এ্যাইসা চিমটি কাটল, মেয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলে ফেলল···

বলে বকুল অবিকল সেই রোশোনার কান্নাজড়ালো এজিন দেবার কণ্ঠস্বর নকল করে খিলখিল হেসে খুন।

অদ্ভুত মেয়ে বকুল। এই হাসি এই কান্না। আমিও হাসতে থাকি। আর সেই সময় হঠাৎ দরজা ডিঙিয়ে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক ঘরে ঢুকে পড়েন। বেঁটে এবং নাদুসনুদুস চেহারা। ছোট করে চুল ছাঁটা। গোঁফ নেই বললেই চলে, চিবুকে একটুখানি সুচলো কাঁচাপাকা দাড়ি।—মুকুল! কই রে বাবা। বলে ঢোকেন তিনি।

বকুল উঠে দাঁড়ায়। অবাক হয়ে দেখি, আইবুড়ো মেয়ে হয়েও মাথায় আঁচল টেনে প্রায় ঘোমটায় মুখ ঢাকে। অস্ফুটস্বরে কী যেন বলে এবং বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।

ভদ্রলোক আমার দিকে এমন দৃষ্টে তাকান, অস্বস্তি হয়। সামনে এসে একটু হাসেন। বলেন—কা? বল তো আমি কে?

—আপনি কাজীসায়েব।

—ভুলে গেছি। (বকুল নামটা তখন বলছিল—ম, ম, যাঃ। মনে আসছে না।)

উনি হা হা করে হেসে বিছানায় পা ঝুলিয়ে বসেন।—বাবা সারাজীবন মোক্তারী করে চুল পাকিয়ে ফেললুম। ভুলে গেছি বললে তো আইনে শুনবে না!

—আইন মানে?

—আইন মানে? হাঃ হাঃ হঃ! বাবাজীবন এতকাল পরে হারানো ছেলে ফিরে এসে প্রপার্টি দাবি করবে—আইন না হলে চলে রে সোনা? ও তো ডাল ভাত নয়।

—কে প্রপার্টি দাবি করেছে?

তুমি!

—না।

কাজীসায়েব আবার জোর হেসে বলেন—ওযে মানিক, কার্যত তাই-ই যে দাঁড়াচ্ছে। তুমি মুকুল বলে দাবি করছ নিজেকে, তার মানে তুমি দাবি করছ যে, তুমি চৌধুরীসায়েবের ঔরসজাত পুত্র। তার লিগ্যাল মিনিংস হচ্ছে, তুমি ওঁনার যাবতীয় প্রপার্টির ওয়ারিশ। কেমন ?

—আমি কিছু দাবি করতে আসিনি।

—তবে কেন এসেছ, মানিক ?

—বা রে। আমার আব্বার কাছে আমি আসব না ?

কাজীসায়েব হাতের তালু অদ্ভুত ভঙ্গীতে দুলিয়ে বললেন—এ্যাই! তার মানেই কার্যত তার সম্পত্তির ওয়ারিশ হওয়া। অতএব তুমি—বাবাজীকে আগে লিগ্যালি প্রমাণ করতে হবে যে, তুমিই সেই মুকুল। বুঝতে পারছ তো ?

আমি ফ্যালফ্যাল করে তাকাই। আইনজ্ঞ লোকটির চোখে ধূর্ত শিয়ালের মতো নীল ছটা দেখি। কথা খুঁজে পাই নে। টের পাই, যদি সত্যিকার মুকুল হতুম, তাহলে একই ব্যাপার দাঁড়াত।

—যেই হও, এয়েছ—থাকো। মেহমানী করো না। অন্ধ লোকটাকে যেন ঠকিও না। যত শিগগির পারো, কোথায় কোথায় ছিলে, কার-কার কাছে ছিলে—সব ডিটেল প্রমাণ-পত্র কাগজে লেখো। লিখে আমার সঙ্গে থানায় যাবে। তারপর আদালতে এফিডেভিট করবে। অনেক হ্যাঙ্গামা আছে, বাবা। বিস্তর।

বলে ভদ্রলোক পকেট থেকে বিড়ি বের করে ধরালেন। কয়েকটি টান দিয়ে তারপর বলেন—তো সেকথা পরে। এখন গুটি কতক কথার জবাব দাও দিকি।

ঘরের শীতটা আর নেই যেন। আমার গায়ে ঘাম চরচর করছে টের পাই। শ্বাস-প্রশ্বাস ঘন হচ্ছে। আস্তে বলি—বলুন।

আর সেই মুহূর্তে দরজার ওপাশ থেকে বকুলের তীব্র কণ্ঠস্বর ভেসে আসে—না। ও আপনার কোন কথার জবাব দেবে না।

কাজীসায়েব ঘুরে দরজার দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বলেন, —মা বকুল! এ সংসার বড় ফেরেববাজি ধোঁকাবাজির জায়গা রে। তোর বয়স কম—বুঝবি নে! চৌধুরীসায়েব অন্ধ মানুষ। তাঁকে এখন সবাই ঠকাতে চাইবে যে। যাচাই করতে দে, মা।

বকুল প্রায় গর্জন করে—না। আপনি চলে যান, চাচা।

কাজীসায়েবের মুখটা গম্ভীর হয়ে ওঠে সঙ্গে সঙ্গে।—আমাকে তুই···আমাকে তুই চলে যেতে বলছিস!

—হ্যাঁ, বলছি।

—নাদান মেয়ে! ঘরে ঠগ ঢুকেছে জানিস না?

বকুল এবার দরজায় এসে দাঁড়ায়। মাথার সেই ঘোমটা খসে গেছে। দু'চোখে আগুন জ্বলছে। নাসারন্ধ্র ফুলে উঠছে। হাঁফাতে হাঁফাতে বলে—বেরিয়ে যান বলছি। বেরিয়ে যান এক্ষুণি!

কাজীসায়েব লাল মুখে তক্ষুণি উঠে দাঁড়ান। বিড়িটা পাম্প সু জুতোর তলায় ঘষে নিবিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে যান। বকুল পাশ কাটিয়ে তখন ঘরে চলে এসেছে।

আমার সামনে এসে সে ভেংচি কেটে বলে—খুব যে তখন বড়াই করছিলি। এখন তো মুখে রা নেই! তোকে শয়তানটা অপমান করছে, আর মুখ বুজে স'য়ে যাচ্ছিস্?

—বকুল, চুপ কর্।

—না, চুপ করব না। কেন তুই ওর কথাগুলো হজম করে গেলি? তুই অতটুকু ছেলে যখন, তখন ওই শয়তানটাকে জব্দ করতে পেরেছিস—এখন তুই কত বড়!···বকুল হাঁসফাঁস করে কথা বলতে।—তোর ভয়ে ও এ-পাড়ায় আসা ছেড়েছিল, মনে পড়ে না?

মনে মনে জবাব দিই—আমি যে সত্যিকার মুকুল নই।

সত্যিকার মুকুল এতক্ষণ লোকটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত হয়তো. আমি পারলুম না।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে বকুল সব তেজ হারিয়ে ফেলে যেন।—আব্বাকে বলছি, তোকে অপমান করে গেল কাজী সায়েব। তুই দরজায় খিল এঁটে চুপচাপ ঘুমো। আমি কাউকেও সিঁড়িতে উঠতে দেব না। গাঁয়ের কারও সামনে তোকে যেতে দেব না। খবর্দার মুকুল, যদি এর পর কারও সঙ্গে কথা বলিস, তোর সঙ্গে আড়ি।…

তেজস্বিনী সরলপ্রাণা যুবতী ফুঁসতে ফুঁসতে বেরিয়ে যায়। দরজা বাইরে থেকে টেনে বন্ধ করে বলে—খিল এঁটে দে।

তখন উঠে গিয়ে খিল এঁটে দিই। একটুখানি দাঁড়িয়ে বাইরে সিঁড়িতে ওর পায়ের শব্দ শুনি। তারপর এসে শুয়ে পড়ি.

খুব ভাবনা হয়। ওই কাজী লোকটা আমার পরিচিতি নিয়ে ঘোঁট পাকাবেই। ওর দু'চোখে অবিশ্বাস আছে। কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা, ও পুলিশ লেলিয়ে দেবে কি না! যদি সত্যিসত্যি তাই করে বসে, আমার কি হবে বেশ বুঝতে পারছি।

কিন্তু সত্য তো এরকমই। জীবনে সত্যগুলো খুব কড়া জিনিস। কম লোকই সত্যকে চায় বা সহ্য করতে পারে। কাজী লোকটা সেই নির্বিকার নিষ্কলুষ এবং যথার্থ সত্যকে সামনে ঠেলে দিয়েছে। সেদিক থেকে ভাবলে ওর প্রশংসা করা উচিত। ও যুক্তিবাদী। বেঁচে থাকা এবং ভালভাবে বেঁচে থাকার নিয়মকানুন সম্পর্কে ওর প্রচুর অভিজ্ঞতা আছে মনে হয়। প্রতীয়মান সত্য নিয়ে দুধের

বদলে পিটুলিগোলা খেয়ে ধেই ধেই করে অজস্র মানুষ নাচে। কাজীর মতো মানুষ প্রতীয়মানের বস্তা এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে সত্যের পিণ্ড বের করে দেয় এবং হয়তো দেখা যাবে, প্রকৃত সত্য একটা ফুলে ঢোল, পচা বিকৃত লাশ মাত্র।

এই সব ভাবনা চিন্তায় এবং কাজীকে বিজ্ঞানীর উঁচু আসন দিতে-দিতে মুখ দিয়ে বারবার বেরিয়ে আসে—শোভানাল্লা! তখন নিজের ওপর রেগে যাই এবং বালিশ আঁকড়ে ছটফট করি।

অন্ধ মানুষটি শোকে জীর্ণ। তাঁর পক্ষে ভুল করা সহজ। কিন্তু বকুলের মতো বুদ্ধিমতী আর অনুভূতিশীল মনের মেয়ে এমন ভুল করছে কেন? একটু পরে বুঝতে পারি, মাতৃহীনা নিঃসঙ্গ মেয়েটির সারাক্ষণের ভাবনায় ও স্বপ্নে সেই মুকুল ভাইটি থেকে গিয়েছিল। মায়ের মৃত্যুর মতো ভয়ঙ্কর এক ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে থেকেছিল তার স্মৃতি—ওতপ্রোত। নিঃসঙ্গতা ও দুঃখের নদীতে ভেসে যেতে যেতে তাই যেন বকুল বাবার মতোই অন্ধ হয়ে একটা তৃণ খণ্ড আঁকড়ে ধরেছে। যদি সে সারসত্যটা টেরও পায়, তার উপায় নেই। আমাকে আঁকড়ে ধরে শূন্যতা থেকে বাঁচতে চাইবে। বকুলের জন্যে আমার দুঃখ হতে থাকল।

তারপর যখন সে স্নানের জন্যে আমাকে ডাকতে এসেছে, খিল খুললে মুখের দিকে তাকিয়ে বলে—ঘুমোস নি?

মাথা নাড়ি। চুপচাপ তাকিয়ে থাকি ওর দিকে। দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে ও আরো অবাক হয়। আবার বলে—কাজীসায়েবের কথা ভেবে ভয় পেয়েছিস?

—বকুল, ধর্—এমন যদি হয়, তোদের—মানে তোরই ভুল হচ্ছে।

বকুল তীক্ষ্ণদৃষ্টে তাকিয়ে বলে—কিসের ভুল?

—আমি···আমি মুকুল নই।

বকুলের চোখে কি আগুন জ্বলে ওঠে ধূ ধূ। কয়েক মুহূর্ত

নিষ্পলক তাকিয়ে সেই আগুন দাউ-দাউ জ্বালিয়ে দিতে-দিতে হঠাৎ সে আমার জামার কাঁধের দিকটা দুহাতে খামচে ধরে এবং কী করবে ভেবে না পেয়ে হিস হিস করে ওঠে—তবে কে তুই ?

—আমি বাণ্ডিল। আমি বিপ্লব। আমি অনিন্দ্য।

মুহূর্তে বকুল বদলে যায়। ওর মুখে ম্লান হাসি ফোটে। যেন ঘাম দিয়ে ছাড়ার ক্লান্তিতে হাত সরিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়ায়। আস্তে আস্তে বলে—এতদিন তাহলে ওই সব নামে ঘুরেছিস! বাঃ! যা ছিলি, ঠিক তাই।

চুপ করে থাকি। বকুল সেই হাসি মুখে রেখে আবার বলে—বাড়ি ঢুকে থামের আড়ালে লুকিয়ে হাত নাড়তিস। মা রান্নাঘর থেকে বলতেন—কে রে! তুই বলতিস—আমি পেঁচো। আব্বাকেও অমনি তামাসা করতিস। কে ওখানে, জিগ্যেস করলে বলতিস—মেধো বায়েন মিয়াসাব। কিন্তু আজ অমন করে বললে আমার কষ্ট হবে, মুকুল। আর তো আমাদের সে'দিন নেই রে! অবস্থা দেখে কি কিছু বুঝতে পারছিস নে। ভাই, খোদার কসম—আমার সঙ্গে যা তামাসা করবি কর। আব্বাজানের সঙ্গে করিস না। কেমন!

তবু জেদ চেপে যায়। বলি—না, বকুল। সত্যি বলছি, আমি মুকুল নই। আমি বিপ্লব—আমি অনিন্দ্য—আমি···

বকুল হাসে। শুকনো হাসি। সে বলে—আচ্ছা বাবা, তাই হল। কিন্তু তুই যে বিপ্লব না অনিন্দ্য কী ছাই বলছিস, প্রমাণ দে।

—প্রমাণ!

—হ্যাঁ, প্রমাণ। অকাট্য প্রমাণ চাই কিন্তু

—প্রমাণ···অকারণ পকেট হাতড়াই। শূন্য তাকাই ওর দিকে। সত্যি সত্যি কোন প্রমাণ তো নেই। তখন বলি—তুই যে কাজীসায়েবের মতো বলছিস, বকুল।

—বলছি।

কিন্তু আমি মুকুল, তারও তো প্রমাণ নেই। কতকগুলো রাস্তার লোক আমাকে এবাড়ি এনে ঢোকাল। আমার যাওয়ার দরকার ছিল—ঘুমোবার দরকার ছিল। সারারাত আমি একশো মাইল ছুটেছি—আমার একটা নীল ঘোড়া আছে…

বকুল এবার ভয় পেয়ে যায়। সে কি আমাকে ছিটগ্রস্ত ভাবে? ওর চোখে সেই ভয় আর তীব্র চিৎকার শব্দহীন। সে আস্তে পরম স্নেহে আমার একটা হাত নিয়ে বলে—তোর শরীর ভাল নেই। আয়, ভাল করে গা ধুবি—মাথায় টিউবেলের জল ঢালবি। দেখবি, সব ঠিক হয়ে যাবে।…

সি / সাত

বিকেলে ওপরের ঘর থেকে দেখেছি, চৌধুরী-বাড়ির সামনের লনে ভিড় জমেছে। দলে দলে লোকেরা মুকুলকে দেখতে এসেছে। বুদ্ধিমতী বকুল আমাকে ওদের সামনে যেতে দেয় নি। চৌধুরীসাহেবও ভিড় দেখে বিরক্ত হয়েছেন। শেষ অব্দি তিনি রাগ করেছেন। বলেছেন—এ কি তামাসাবাজী হচ্ছে—না সার্কাস? ঘরের ছেলে ঘরে ফিরেছে—দেখব'খন। এখন যাও সব। ও ঘুমোচ্ছে।

খাবার সময় বলেছিলেন—খোকা, তোর মায়ের কবরে একবার যাওয়ার বড় দরকার, বাবা। আমিই নিয়ে যাব'খন। মাফ চেয়ে নিবি বেটা। মরার সময় তিনি মাফ করে গিয়েছেন—তাহলেও তুই এখন সাবালক। নিজের মুখে মাফ চাইবি! ওঁর রুহ্ (আত্মা) শান্তি পাবে।

ভিড়ের জন্যে যেতে দেরি হয়ে গেল। সন্ধ্যার আজান শোনা

যাচ্ছিল গম্বুজওয়ালা ওপাশের মসজিদ থেকে। বাইরের বারান্দায় অন্ধ বৃদ্ধ নমাজ পড়ছেন, দেখছিলাম। তারপর বকুল আমাকে ডেকে নিয়ে গেল নীচে। ইসারায় আমাকে ওর বাবার হাত ধরতে বলল। বৃদ্ধ একহাতে লাঠি নিয়ে অন্য হাতে কাঁধে রেখে বেরোলেন। বকুল দাঁড়িয়ে আছে দেখে বললুম—তুই যাবি নে ?

দিনের আলো খুব কম কমই ছিল। বকুল দুঃখিত মুখে বলল—মেয়েদের যাওয়া বারণ গোরস্থানে। আমি যাব না রে !

চৌধুরীসাহেব দাঁড়ালেন। একটু ইতস্ততঃ করে বললেন—ইয়ে, ইচ্ছে হলে আয় বকুল। তোর মা খুশি হবেন। একটু হাসলেনও। —সব সময় শরীয়ত মেনে চলা কঠিন। বুঝলি মুকুল ? কতকগুলো হিউম্যান এ্যাসপেক্ট আছে, এড়িয়ে থাকা যায় না। বকুল, তুইও আয় মা। সন্ধ্যাবেলা তো। চলে আয়।

বকুলের দ্বিধা কেটে গেল তক্ষুনি কিন্তু মাথা ঢাকতে ভুলল না। এসে চাপা গলায় বলল—তোর পকেটে রুমাল আছে তো ? গোরস্থানে ঢোকার সময় টুপির মতো মাথাটা ঢেকে নিবি।

হাসতে হাসতে বললুম—আব্বা ! বকুলটা বড্ড ধার্মিক হয়ে পড়েছে তো ?

চৌধুরীসাহেবও হো হো করে হাসলেন।—বরাবর তাই। স্কুলে যেত, আর মেয়েরা ওকে ঠাট্টা করে বলত হাজীবিবি। রেগে স্কুল যাওয়া বন্ধ করত। আমি আমার সঙ্গে করে নিয়ে যেতুম।

—ওকে কলেজে পড়ালেন না কেন, আব্বা ?

—কলেজ তো সেই কাটোয়ায়। বাসে যাতায়াত করতে হবে গঙ্গা পেরোতে হবে—কত হ্যাঙ্গামা। এদিকে চোখের ছানি কাটাতে গিয়ে দুটো চোখই খুইয়ে বসলুম। কী করি বল্ না।

—এবার তো আমি এসে পড়েছি। ওকে···

বকুল বাধা দিল। —কলেজে পড়ে পিঠে ডানা গজাবে, না ?···

আমরা এইসব পারিবারিক কথাবার্তা বলতে বলতে গেট পেরিয়ে

রাস্তায় যাই। অন্ধ বৃদ্ধের জন্যে খুব আস্তে হাঁটতে হয়। তাঁর হাত থাবার মতো আমার কাঁধেব হাড় আঁকড়ে ধরে আছে। কেমন একটা অস্বস্তি হয়। কিছুটা এগিয়ে বাঁদিকে গোরস্থান দেখতে পাই। ঘন গাছপালা কুয়াসার মধ্যে বিশাল পোড়ো দালানবাড়ি হয়ে আছে। মাঠের হাওয়ায় শীতটা বড্ড বেশি। অন্ধ বৃদ্ধ লম্বা ঢিলে শেরোয়ানি পরেছেন, মাথায় পশমী হনুমান টুপি আছে এবং হাঁটু অব্দি মোজা ও পাম্পসু। বকুল গায়ে একটা কার্ডিগান চড়িয়েছে, এবং বিবাহিত মেয়েদের মতো ঘোমটা রয়েছে। আমার নিজস্ব পুলওভার আর মাফলার রয়েছে। তবু শীত করছে। গোরস্থানের গেটের কাছে যেতে-যেতে দিনের আলো ফুরিয়ে যায়। আমি অন্ধকার বলতেই বৃদ্ধ শেরোয়ানীর পকেট থেকে একটা টর্চ বের করেন। তারপর স্বভাব মতো আকাশের দিকে মুখ তুলে থাকেন। বলেন—আমার জন্যে নয়। তোমাদের জন্যে। এই নাও।

বকুল এগিয়ে এসে বলে—আমায় দাও। ও তো কবরটা চেনে না।

সে টর্চ নিয়ে সামনে যায়। ডানদিকে আলো ফেলে বলে—ওই যে!

দেখি, একটা ইটের কবর—সামনের মার্বেল ফলকে বাংলায় কী একটা নাম লেখা আছে এবং জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ। তিনজনে পাশাপাশি দাঁড়াই। বকুল টর্চ নিবিয়ে দেয়—যেন পবিত্রতার হানি হবে। অন্ধ বৃদ্ধ আমার কাঁধ ছেড়ে দুহাত বুকের কাছে কিছু পাওয়ার ভঙ্গীতে জোড় করেন। বিড়বিড় করে কিছু বলতে থাকেন। দেখা দেখি আমিও তাই করি। আড়চোখে দেখি বকুলও একই ভঙ্গীতে বিড়বিড় করে কিছু বলছে।

তারপর টের পাই, আমি কিছু বলছিনে। আমার কোন প্রার্থনা নেই—স্বীকারোক্তি নেই। ভাষা খুঁজে পাচ্ছিনে। সত্যিকার মুকুল হলে কী করত, জানিনা। মাতৃহন্তা পরশুরাম কি হাতের কুঠার হাত

থেকে খসে পড়ার প্রার্থনা করত? নিঃঝুম হিম গোরস্থানে এখন অন্ধকার ঘন হয়েছে। কবরের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি। মৃতরা কি সব টের পায়? হঠাৎ মনে হল, একজোড়া সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টির মধ্যে আমি আটকে পড়েছি। তীব্র জ্বলন্ত দুটি চোখ কবরের অন্ধকার থেকে দেখছে আমাকে। একটা শীর্ণ হাড়ের হাত হিম আঙুল তুলে আমাকে নির্দেশ করে চাপা গলায় বলছে—তুই কে? আর সেই ঠাণ্ডা—ভীষণ ঠাণ্ডা আঙুল যে মুহূর্তে আমার কাছাকাছি চলে এসেছে, আমি ভয়ে চোখ বুজে ফেলেছি।

এই সময় কোথাও আচমকা প্যাঁচা ডেকে উঠল···এ্যাঁও এ্যাঁও এ্যাঁও! পাখির ডানা ঝাপটানি শোনা গেল! শিরশির করে একটা হাওয়া এসে পড়ল। শেয়াল ডেকে উঠল খুব কাছাকাছি। অন্ধ বৃদ্ধের আরবীভাষায় মন্ত্রোচ্চারণ অমনি আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল। আমি টের পেলুম, বকুল আমার গা ঘেঁষে এসেছে এবং আমিও বৃদ্ধের গা ঘেঁষে সরে এসেছি। আর এতক্ষণ পরে বলছি—আমায় ক্ষমা করো, আমায় ক্ষমা করো।······

একটু পরে রাস্তায় পৌঁছে চৌধুরীসাহেব বলেন—হঠাৎ একটা হুলস্থূল হচ্ছিল—আমার তাই মনে হল। বুঝলি রে? আচমকা যেন কী সব ঘটতে শুরু করল। ভেরি স্ট্রেঞ্জ!

বকুল বলে—হুঁ। আমার খুব ভয় করছিল।

আমি বলি—প্যাঁচা ডাকল, শেয়ালগুলোও ডাকল।

বকুল হাসল।—শেয়াল প্যাঁচা বুঝি নতুন ডাকল?

বৃদ্ধ বলেন—ওর কি সে-সব আর মনে আছে? থাকততো বোম্বাইতে। সেখানে শেয়াল কোথায়—প্যাঁচাই বা কোথায়! তবে একটা ব্যাপার—বুঝলি খোকা। বকুলও শোন্। তোমার মায়ের রুহ্ চঞ্চল হয়েছিল খোকাকে দেখে। আমি স্পষ্ট ফিল করলুম।

বকুল হেসে ওঠে—কিন্তু ও তো দোয়াদরুদ (মন্ত্র) পড়তেই

জানে না। বলছিল কী, আমাকে ক্ষমা করো···আমাকে ক্ষমা করো ক্ষমা কী রে? মাফ করো বলছি—তা নয়, ক্ষমা করো।

বৃদ্ধ হাসতে হাসতে বলেন—ভাষায় দোষ নেই। আইডিয়াটাই মূল।

বকুল হঠাৎ আমার মাথায় হাত ছুঁইয়ে বলে—একী! তুই তখন মাথা ঢাকিস নি?

—যাঃ! ভুল হয়ে গেছে

—আব্বা, তোমার খোকামিয়াকে হিন্দুয়ানি ছাড়াতে অনেক কাঠখড় পুড়বে।

বৃদ্ধ বলেন—হিন্দুয়ানি মুসলমানী সবই ভড়ং, মা। মন সাচ্চা তো বহৎ আচ্ছা।

আমি তামাসা করে বলি—আব্বা! তোমার মেয়ে বড্ড গোঁড়া ধার্মিক ওর আত্মার শুদ্ধি দরকার।

সরল মনেই অন্ধ বলেন—বাতিক! বাতিক! বাড়িতে একা কাটিয়েছে—আর তো ভাই বোন নেই, লোকজনও তেমন নেই যে মেলামেশা করবে। তাই ওই। যার যা হবি!

বকুল রেগে যায়।—তুমি হবি বলছ? শরীয়ত মেনে চলা হবি? বাতিক?

অন্ধ হো হো করে হেসে সব উড়িয়ে দেন। তারপর বলেন—যে বনে আমি ছিলুম একেবারে উল্টো। ভুলেও নমাজ পড়তুম না। তারপর বয়স বাড়ল। একটা প্ল্যাটফর্ম তো চাই—না কী?

বলে ফেলি—আমার কিন্তু কোন প্ল্যাটফর্মই নেই।

—নেই। পরে নিজেই খুঁজে নিবি, বাবা। খোদার দুনিয়ার সবই থরে থরে মজুত রয়েছে। দরকার হলে ঠিকই পেয়ে যাবি। এখন দরকার হচ্ছে না, তাই

খুব ভাল লেগে যায় বৃদ্ধকে। খুশি হয়ে বলি—ঠিক বলেছেন, আব্বা।

কিন্তু—'আব্বা!' বড় অচেনা লাগে এই শব্দ। দুরূহ আর কষ্টকর মনে হয় বকুলের 'শরীয়ত।' বরাতের জোরে যদি বা আপাতত একটা জায়গা জুটল, এত রকম অচেনা ও দুর্গম ব্যাপারের মধ্যে দিয়ে আমাকে চলতে হবে! এ একটা কঠিন সমস্যা। নতুন পরিচিতিকে পোক্ত করতে নতুন পাঠশালায় নতুন পড়া পড়তে হবে। এরা যদি হিন্দু হত, কোন সমস্যাই ছিল না; সহজে আমি মুকুল হয়ে উঠতুম।

এখানেই আমার জোরটা নেই—খাটে না। আঃ! মানুষের জন্মানো কী গোলমেলে ব্যাপার! হিন্দু মুসলমান খ্রীস্টান ইহুদী মানুষ। শিশুরা এইসব মানুষের ঘরে-ঘরে জন্মায়। কে কোথায় জন্মাবে, তার নিজের এক্তিয়ারে তো কিছু নেই।

খুব ঘটা করে দিনের মতো রাতের খাওয়াটাও হল। রাজকীয় ভোজন বলা যায়। কলকাতার বড় মুসলিম হোটেলে এধরণের খাওয়ার অভিজ্ঞতা আছে। অসুবিধে হল না। তারপর ওপরের সেই ঘরে শুতে গেছি, বকুল সঙ্গে আছে।—তোর বিছানাটাই তো দখল করলুম। তুই কোথায় শুবি?

বকুল বলে—ওই তো ও-ঘরে।

—তোর অসুবিধে হবে না তো?

বকুল ঘাড় নাড়ে। তারপর বিছানায় আমার পায়ের দিকটায় বসে। সে নখ খুঁটতে খুঁটতে বলে—এবার তোর হিস্ট্রিটা বল। কোথায় ছিলি—তারা কেমন মানুষ······

—আজ না রে। ঘুম পাচ্ছে।

বকুল তার কব্জিতে চোখ বুলিয়ে বলে—মোটে তো ন'টা বাজে বাবা।

হাই তুলে বলি—না শুনলে চলবে না? সে বড় ভয়ঙ্কর রে। শুনলে তোর কষ্ট হবে। দেখেছিস তো আমার সারা গায়ে কত ঘায়ের দাগ। মানুষ আমার ওপর কী ভীষণ অত্যাচার করেছে, শুনলে তুই মাথা ঠিক রাখতে পারবি নে।

বকুলের গলার স্বর ভাল লাগে। সে বলে—কেন অত্যাচার করল? কী করেছিলি?

—সাজানো ত্বনিয়াটা ভাঙতে গিয়েছিলুম।

—কেন?

—জানি না। মনে হত সবটাই ফাঁকি আর ধাপ্পা দিয়ে তৈরী। হু'চোখের বিষ ছিল।

—এই ত্বনিয়াটা?

—হ্যাঁ, তোদের এই ত্বনিয়াটা।

ভেঙে কী লাভ? ত্বনিয়াটা তো একা কারুর নয়। অনেক লোকের। একেক জন একেক রকম।

—অত ভাবিনি। এখন তাই লাগে।

—খুলে বল্, কী করেছিলি?

—বললুম তো। সাজানো বাগান তছনছ করতে গিয়েছিলুম। সহ্য হচ্ছিল না।

—বুঝি না। আরও স্পষ্ট করে বল।

—বোমা ফাটাতুম। গুলি ছুড়তুম। মানুষ মারতুম।

বকুলের মুখে একটা নিঃশব্দ আর্তনাদ ছড়িয়ে এল। ও ঠোঁট কামড়ে ধরল। তারপর অস্পষ্ট করে বলল—তুই খুব সাংঘাতিক লোকের পাল্লায় পড়েছিলি রে। মা মরার সময় তোকে দোওয়া করে গিয়েছিলেন, তাই তুই বেঁচে-বর্তে ফিরেছিস। কেমন করে ওদের খপ্পরে গেলি? গোড়া থেকে বল্।

টের পাই, ও গোঁ ধরেছে—না শুনে ছাড়বে না। অতএব বলতেই হবে। গোড়ার দিকটা বানিয়েই বলতে হবে। তারপর বিপ্লবে পৌঁছলেই সেখান থেকে সবটাই সত্যি বলা যাবে।

এবং বলা দরকার। ওর সামনে একটা স্বীকারোক্তি জরুরী হয়ে তো উঠেছেই। পাপ কিংবা পুণ্য করেছি জানি না, কিন্তু আমাকে সব বলতেই হবে।

তাই শুরু করি। বকুল গায়ে একটা বালাপোষ ভাল করে মুড়ি দিয়ে পা তুলে বসে। আমি লেপের মধ্যে অর্ধেকটা ঢুকে বালিশে কনুই ভর করে বলতে থাকি। প্রথম অধ্যায়টা বানিয়ে বলতে হয়। স্টেশনে ট্রেনে ওঠা, হাওড়ায় পৌঁছানো—সেখানেই প্ল্যাটফর্মে বোম্বাইয়ের এক ব্যবসায়ী পরিবারের সঙ্গে আলাপ, তারপর ওদের সঙ্গে বোম্বাই গিয়ে থাকা—অনর্গল বলে যাই। বাধে না। বকুল প্রশ্নও করে না। তারপর কলকাতায় চলে আসি। বিপ্লব-পর্ব ঠিকঠাক বর্ণনা করি। এগারো নম্বর নামের কথা শুনে বকুলের চোখ ফেটে জল পড়ে। তারপর গতকাল সন্ধ্যায় পার্ক স্ট্রীটের বারে চলে আসি। বকুল ভৎসনার ভঙ্গীতে একবার বলে—ছিঃ, মদ খেতিস! যেন খুন করার চেয়ে মদ খাওয়াটা ওর কাছে বেশি খারাপ!

কাল সারারাত এবং আজ সকালে এবাড়ি আসা অব্দি যা কিছু ঘটেছে, অবিকল বলি। এতটুকু বাদ দিই না। রিভলবার স্টেশনের পুকুরে ছুঁড়ে ফেলার কথা শুনে বকুল উদ্বিগ্ন হয়ে বলে ওঠে—পুলিশ খোঁজে-খোঁজে যদি চলে আসে! মুকুল, এখনই আব্বাকে সব বলে রাখা দরকার! ওঁর অনেক জানাশোনা আছে। ভাবিস নে।

ব্যাপারটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে এতক্ষণ ভাবিনি। এবার অস্বস্তিটা আরও বেড়ে গেলে। কোন্ অধিকারে আমার সব পাপের দায় এক অন্ধ শোকগ্রস্ত বৃদ্ধের কাঁধে চাপাব? অথচ ধরা পড়লে অনিবার্যভাবে আমার মধ্যে থেকে সেই এগারো নম্বর লাশটা ঠিকই বেরিয়ে পড়বে, এবং আমার বিচার হবে জঘন্য হত্যাকারী হিসেবে। তারপর আমি শেষবারের মতো প্রকৃত লাশ হয়ে যাবই যাব।

বাঁচার তীব্র ইচ্ছে আমার মধ্যে ছটফট করে উঠল। আমাকে বাঁচতে হলে কোন একটা পরিচিতির তকমা আঁটতেই হবে। মকলের তকমাটা যখন হাতের কাছে পেয়েছি, লড়ে যাই।

সিদ্ধান্ত নিয়ে আমি ঠাণ্ডা গলায় বকুলকে বলি—হ্যাঁ। ওঁকে বলা দরকার।

বকুল উদ্বিগ্নমুখে একটু ভেবে বলে—আব্বা এখনও শোনে নি। যাবি ওঁর কাছে ?

—না। তুই আগে সংক্ষেপে ব্যাপারটা বল্। উনি কী পরামর্শ দেন, শুনে এসে আমাকে বল্। তারপর দরকার হলে আমি যাব।

বকুল তক্ষুণি খাট থেকে নেমে বেরিয়ে যায়। আমার কষ্ট হয়। একটা শোকগ্রস্ত শান্ত পরিবারে আবার অশান্তির ঝড় এনে ফেললুম। বোধ হয়, ঠিক হল না। তার চেয়ে এখনই চুপিচুপি কেটে পড়ছি না কেন ?

জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়াই। একটা পাট খুলতেই ঠাণ্ডা কনকনে হাওয়া ঝাঁপিয়ে পড়ে মুখে। বাইরে অন্ধকার পৃথিবী শীতে নিঃসাড় হয়ে আছে। মনে হল, বাইরে পা বাড়ালেই লক্ষ লক্ষ শীতের ডাইনী নখ চিরে ফেলবে। তাদের হিম হাসির তীক্ষ্ণ আওয়াজ যেন শুনতে পাচ্ছি। এই সুন্দর বিছানার ওম ফেলে বেরিয়ে পড়ার সাহস হচ্ছে না।

কিন্তু যদি আজ রাতেই পুলিশ এসে এই বাড়িটা ঘিরে ফেলে! রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে ভাবিনি—এদিকটা এতক্ষণ ভাবিনি! বুদ্ধিমতী বকুল তক্ষুণি টের পেয়ে গেছে—অথচ আমি পাইনি। আজ সারাটা দিন এই নতুন জীবন আমাকে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে দেয়নি।

হঠাৎ মনে পড়ল কাজী লোকটার কথা! ও কি পুলিশের কানে তুলবে যে, কে একজন চৌধুরীবাড়ি এসে নিজেকে মুকুল বলে দাবি করছে ? কিছু অসম্ভব নয়। খুব ঘাড়েল আইনবাজ লোকেরা কী হয়, জানি। স্বার্থের দিকে ওর যা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, ও গ্রামে গিয়ে শুধু ঘোঁট পাকাবে না—আরও এগিয়ে যাবে। আমাকে তাড়াবার চেষ্টাই করবে।

তারপর মনে হল, রেলপুকুরের সেই মেয়েটির হাতে আমার এই সমস্যার চাবিকাঠি রয়েছে। সে যদি সব গোপন করে……

হ্যাঁ, যদি একমাত্র সেই সব গোপন করে।

কিন্তু ব্যাপারটা যা ঘটেছে, গোপন করা সত্যি বড্ড কঠিন। আমি হলেও কি অমন উদ্ভট কাণ্ড দেখে কারুর কাছে না জানিয়ে থাকতে পারতুম? বিশেষ করে মেয়ে সে। মেয়েদের পেটে নাকি কথা থাকে না। মেয়েটি নিশ্চই আমার অদ্ভুত আচরণে অবাক হয়েছিল। সে তার দাদা-বউদির কাছে না বলে থাকতে পারবে না। সেই দাদাটি কেমন লোক, তার ওপর এবার সবটা অবশ্য নির্ভর করছে। দাদাটা কেমন লোক? সে যদি গোবেচারা হয়—উড়িয়ে দেবে। বিশ্বাস করবে না। কিংবা ভাববে তার বোন একজন পাগলের পাল্লায় পড়েছিল। কিন্তু অনেক লোক থাকে, সবটাতেই বড্ড কৌতূহলী। সে যদি বোনের কথা শুনে পুকুরে ঝাঁপ দেয়—কিংবা পুলিশেই খবর দিয়ে বলে, রিভলবারটা পেয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। ওটার যা ওজন, পাঁকে কতটা ডুবে যাবে, জানিনা। মনে হচ্ছে, জলের ঊর্ধ্ব চাপে পাঁকের ওপরই পড়ে থাকবে। তাহলে তো জেলেদের জালে সহজেই ওটা উদ্ধার করা যাবে।

ঘরে কেরোসিন-বাতি জ্বলছে। আলো খুব কম। আরও কম করে দিতে জানালা থেকে সরে যাই আমি। তারপর বাতির দিকে হাত বাড়াতে গিয়ে হঠাৎ মনে হয়, কেন এত কিছু ভেবে অস্থির হচ্ছি? কিছু তো না ঘটতেও পারে!

হ্যাঁ—কিছু না ঘটতেও পারে।

বিশাল রেলপুকুরের অতল জলে কে কী ফেলেছে, তা নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে পয়েন্টসম্যানটি পান চিবুতে চিবুতে স্টেশনে যেতে পারে।

ননীদার খুনের উৎস খুঁজতে পুলিশ কলকাতার আশি লক্ষ লোকের ভিড়ে হন্যে হয়ে বেড়াতে পারে।

বাণ্ডিলের বিষাক্ত গুটিপোকা মুকুল নামে প্রজাপতি হয়ে রঙীন ঝলমলে ডানা মেলে ততক্ষণ ঘুরে বেড়াতে পারে—স্বচ্ছন্দে স্বাধীনতায়। শোভানাল্লা!

একলাফে বিছানায় উঠি। লেপে ঢুকে পড়ি। গভীরতর ওমে নিজেকে লুকিয়ে রাখি। বিশাখার কথা ভাবতে থাকি। নীল ঘোড়াটা ঘুম-ঘুম চোখে তাকায়। একশো মাইল যাত্রার তুমুল অর্কেস্ট্রা একে-একে থেমে যায়। এখন বিশাখার—শুধু বিশাখারই জন্যে নির্ধারিত নির্জন সময় আকাশের নক্ষত্র থেকে অন্ধকার পৃথিবীতে নেমে এসেছে। এখন আর অন্য কথা নয়।……

যখন ঘুম ভাঙে, মনে হয় কেউ চাপা গলায় কান্নাকাটি করছে। তারপর বুঝতে পারি, ওটা কান্না নয়—সুর ধরে কেউ কিছু পড়ছে। বকুলই কি? খুব ভাল লাগে সুরটা। ঘরে অন্ধকার আর নেই। হাল্কা আলো। জানালাটা বন্ধ করে দিয়েছে কেউ—ফাঁক দিয়ে কুয়াসার নাল রঙমাখা একফালি গোলাপী আলো ছুরির ডগার মতো ঢুকে পড়েছে। টেবিলের বাতিটাও কেউ নিভিয়ে দিয়েছিল। হয়তো বকুলই।

সিগারেট বের করে জ্বালি। শুয়ে-শুয়ে টানি। তারপর বকুলের গানটা থেমে যায়। ওঘরে চাপা শব্দ। তারপর দরজা ফাঁক করে বকুল আমার দিকে তাকায়। তার মাথায় ঘোমটা। আমি জেগে আছি দেখে সে একটু হাসে।—উঠেছিস? চা আনছি। মুখ ধুয়ে নে।

বকুল এঘরে চলে আসে। বলি—গান করছিলি নাকি?

বকুল জিভ কেটে বলে—যাঃ! কোরাণ পড়ছিলুম।

ওর মাথা থেকে আঁচলটা নেমে যেতে দেখে ভাল লাগে। বলি—যা, চা নিয়ে আয়।

—মুখ ধুবি তো!

—উঁহু বেড টি খাবো।

—এই মা! বাসিমুখে? বকুল হতভম্ব হয়ে বলে। ছি ছি! শয়তান সারারাত মুখে পেচ্ছাপ পায়খানা করে রাখে জানিস নে? মুখ না ধুয়ে খেতে নেই।

—ভাগ্, অভ্যেস। চা নিয়ে আয়।

বকুল অগত্যা মেনে নেয়। যেতে গিয়ে ঘুরে বলে—রাতে এসে তোকে আর ডাকিনি। দেখলুম বেঘোরে ঘুমোচ্ছিস।

—মাই গুডনেস! আব্বা কী বললেন রে সব শুনে?

বকুল একটু হাসে।—বললেন, সাংঘাতিক কিছু না হলে ও বাড়ি ফিরতই না। তখনই টের পেয়েছিলাম।

—তারপর?

—বললেন, তোর মামুজাকে খবর পাঠিয়েছি—মুকুল ফিরেছে বলে। উনি এসে যাবেন'খন। তখন যা করার উনিই করবেন।

—মামুজী! সে কে?

—খালিশপুরের মামুজী। তোকে কাঁধে চাপিয়ে বেড়াতে বেরোতেন—মনে পড়ছে না? তুই তো তখন ধিঙ্গি ছেলে, নিজের গাড়িতে মেলা দেখাতে নিয়ে যেতেন। কত রূপকথা শোনাতেন।

মামুজী! শোভানাল্লা!

বকুল হাসিমুখে চলে যায়। তারপর আবার উদ্বিগ্ন হই। কাজী লোকটার পাল্লা থেকে বকুল জোর বাঁচিয়েছিল। কিন্তু ইনি আবার কেমন মাল কে জানে। এক অন্ধ বৃদ্ধ আর তার সরলমনা গ্রাম্য মেয়েকে ভুলিয়ে রাখা সোজা। মামুজীকে কি এঁটে ওঠা যাবে?

কিছু তথ্য দরকার ওঁর সম্পর্কে। খুঁটিনাটি ঘটনা কোন সকাল বিকেল—সন্ধ্যার। কোন বিশেষ ঘটনা। এখনই সব জেনে রাখা চাই। মামুজীর চেহারার বর্ণনা চাই। বকুলের কাছে সব জেনে নিতে হবে। আসন্ন উৎপাতের খবরে আবার সব তেতো হয়ে যায়।…

কিছুক্ষণ পরে বকুল প্রকাণ্ড কাপ প্লেট হাতে ঘরে ঢোকে। বনেদী পরিবারের আভিজাত্য কাল থেকেই কত কিছুতে টের পাচ্ছি। দেখেই বুঝতে পারি, এইসব কাপ প্লেট সেকেলে বিলিতী জিনিস। গাম্ভীর্য আর সৌন্দর্য আছে পাশাপাশি। ক্লাসিক সঙ্গীতের মতো।

—মামুজীর কথা শুনি, বকুল!

—সে কী! মামুজীকে ভুলে গেছিস তুই?

—আমার গায়ে এতসব ঘায়ের দাগ দেখে কিছু তোর মাথায় এল না বকুল?

—কী আসবে?

—আমি এগারো নম্বর লাশ হয়ে রাস্তার ধারে পড়েছিলুম না?

বকুলের চোখে ভয়ের আর যন্ত্রণার সেই ছাপটা ফিরে আসে। সে দুঃখিত মুখে বলে—হ্যাঁ। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফ্যালফ্যাল করে তাকায়।

—মরার পর দৈবাৎ মানুষ বেঁচে উঠলে তার আর কি কিছু মনে থাকে! পেছনের জীবনটা আবছা হয়ে ওঠে না বকুল! কী মনে হয় তোর!

বকুল ব্যস্ত হয়ে সায় দিয়ে বলে—হ্যাঁ, হ্যাঁ। একটা সিনেমায় দেখেছিলুম গত বছর। কাটোয়াতে। এ্যাক্সিডেন্টে লোকটা মরতে-মরতে বেঁচে গেল। তারপর তার আর কিছু মনে পড়ছিল না। নিজের বউকেও চিনতে পারল না—বুঝলি! সে…

কথা কেড়ে মনে মনে প্রচণ্ড হেসে এবং মুখে গাম্ভীর্য ফুটিয়ে বলি —আমার মাথার ঘাগুলো তোকে দেখাইনি। মাথায় আঘাত লাগলে স্মৃতিশক্তি লোপ পায়। আমার অবশ্যি খুব বেশি লোপ পায়নি—আবছা মনে পড়ে কিছু।

বকুল উৎসাহ দেখিয়ে বলে—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আব্বা তোর মারধোর খাওয়ার ব্যাপারটা শুনে তাই বলছিলেন রে! স্মৃতিভ্রংশ—না কী যেন…

—স্মৃতিভ্রংশ।

—আব্বা বলছিলেন, আস্তে আস্তে ওর সব মনে পড়বে। এখন কিছুদিন গোলমাল হবে—তবে একদিন সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি বললুম—আব্বা, মুকুল মাঝে মাঝে জ্বরের ঘোরে ভুল বকার মতো কী সব বলছে! নীল ঘোড়া…হাণ্ড্রেড মাইলস…আর…

—বিশাখা! বলে আমি হো হো করে হাসি।

বকুল চোখ পাকিয়ে বলে—খুব হয়েছে! হিন্দু সেজে থাকতিস। হিন্দু মেয়েকে বিয়েও করে ফেলতিস একদিন। পরক্ষণে চাপা হেসে বলে—বিশাখা বুঝি দেখতে খুব সুন্দরী ছিল রে!

—দারুণ। তোর চেয়েও।

—ভাগ্! মামুজীর কথা শোন।

—হ্যাঁ, মামুজীর কথা বল্।

বকুল একটু চুপ করে থেকে বলে—মামুজী এখনও তেমনি আমুদে লোক। এসেই আগের মতো হুলুস্থুলু করেন। তোর কথা বলেন। বলেন—দেখো, মুকুল ফিরে আসবে।

—তাই বুঝি!

—বরাবর উনি বলেন, মুকুল ফিরে আসবেই। তোমরা দেখো, মুকুল না এসে পারে না। আসলে কোথায় কোন শয়তানের পাকে বাঁধা পড়েছে—তাই বেরিয়ে আসতে পারছে না।

—শোভানাল্লা! মামুজী ঠিকই বলেছিলেন!

—হ্যাঁ, অবিকল মিলে যাচ্ছে। উনি বলতেন, বড় বড় শহরে ছেলেধরা দল ঘুরে বেড়ায়। ওরা ছেলেদের ধরে নিয়ে গিয়ে খারাপ কাজের জন্যে তালিম দেয়। নিজেদের দল বাড়ায়। মুকুল ঠিক ওদের পাল্লায় পড়েছে। ওরা মন্তর—তন্তর তুকতাক দিয়ে বশ করে ফেলে কি না। ছেলের মগজ ঘুলিয়ে যায়। আর বাড়ি ফিরতেই চায় না।

—শোভানাল্লা! শোভানাল্লা!

—ভ্যাট্! খালি ইমাম বুড়োর মতো শোভানাল্লা শিখেছিস!

—হুঁ, মামুজীর কথা বল্।

—মামুজীকে দেখলে আর চিনতেই পারবি নে। প্রকাণ্ড মোটা হয়েছেন। সাবরেজিস্ট্রারী থেকে রিটায়ার করেছেন। নজু আনু আর ফিরু তো পাকিস্থানে। মমতার বিয়ে হয়েছিল বহরমপুরে। ওরাও পরে পাকিস্থানে চলে গেছে। বাড়িটা বেচেছে এক উকিলকে।

—এক মিনিট। যাদের নাম বললি ওরা কারা!

—কেন! মামুজীর তিন ছেলে এক মেয়ে!

—মামুজী তাহলে বড্ড একা হয়ে গেছেন রে!

—হুঁ। মামীমা গত বছর আশ্বিন মাসে মারা গেলেন। তারপর বাড়ি ফাঁকা। নজুরা কত সাধাসাধি করে—আমাদের কাছে গিয়ে থাকবেন। উনি বলেন—পাগল, না মাথা খারাপ। বাঙালদের সঙ্গে আমার বনিবনা হবে না। পাজামা পরে মাথায় টুপি দিতে হবে। নমাজ-রোজা করতে হবে।···বকুল হেসে ওঠে।—মামুজী কিছু মানেন না! আজকাল আর প্যাণ্ট-কোট পরেন না আগের মতো। ধুতি পাঞ্জাবি আর হাতে ছড়ি। দেখলে মনে হবে—বামুনপাড়ার কেউ। একেবারে তোর মতো চালচলন আর মুখের বুলি। মামা-ভাগ্নেতে খুব মিলে যাবে।

সঙ্গে সঙ্গে খুশি হয়ে প্রায় চেঁচিয়ে উঠি—শোভানাল্লা!

সি / আট

মুকুলের ছবির সামনে দাঁড়িয়ে আছি। মুকুলের ঠোঁটে বাঁকা হাসি। দু' চোখে তীব্র ঝিলিক তুলে সে বলে—হো নীল ঘোড়েকা সওয়ার! সাবাস! তারপর!

—তারপর কী ঘটবে, দেখে যাও চুপচাপ।

—দেখছি। ব্যাকগ্রাউণ্ডটা খুব শক্ত করে ফেলেছ। বাহাত্বর ছেলে!

—সত্যি কি ব্যাকগ্রাউণ্ডটা খুব শক্ত!

—হুঁউ। স্মৃতিভ্রংশ ব্যাপারটা খুব খাপ খেয়ে যাচ্ছে।

—আর সারা গায়ে ও মাথার ক্ষত চিহ্নগুলো···

—একেকটি সুদৃঢ় স্তম্ভ।

—কিন্তু সত্যি তো আমার পিছনের অনেকখানি আজ আমার কাছে অন্ধকার। আমার নাম ছিল বিপ্লব। আগস্ট বিপ্লবের সময় জন্মেছিলাম। শুধু এটুকুই যা স্পষ্ট। বাকিটা আন্দাজে মিলিয়ে নিই। কিছু মনে পড়ে না। এগারো নম্বর লাশের পিছনের যা কিছু, সব ঘন কালি লেপে দেওয়া।

—চুঃ চুঃ! বেচারা!

—ব্যঙ্গ কোরো না মুকুল! করুণা করো, ভাই!

—এই রে! খোকার মতো কেঁদে ফেললে!

—আমার বড় কষ্ট, মুকুল।

—কেন! বেশ তো আছ। নিশ্চিন্ত আশ্রয়। নিরাপদও। মামুজী আসছেন···

—কিন্তু তোমার অন্ধ বাবাকে, তোমার মহৎপ্রাণা বোনকে ঠকাচ্ছি!

—অনেকে ঠকেই সুখী হতে চায়, জানো না!

—ওরা তো জানে না যে ওরা ঠকছে।

—কী আসে-যায় তাতে! যদি ওরা সুখী হয় হারানো ছেলে ফিরে পেয়ে—হোক্। এই বাড়িতে শোকের-দুঃখের বিশাল ছায়ার ওপর রোদ্দুর পড়েছে এতদিনে। দেখতে পাচ্ছ না! তুমি সরে গেলে তারপর সেই ছায়া আরও ঘন হবে—আরও বিশাল হবে, টের পাচ্ছ না!

—পাচ্ছি। কিন্তু আমাকে তাহলে বাকি জীবন একটা বিরাট

মিথ্যার মধ্যে বেঁচে থাকতে হবে। কেমন করে পারব! আত্মার অপমান!

—মানুষ না পারে এমন কিছু নেই। তুমিও তো বাণ্ডিল ছিলে না—তবু দিব্যি চালিয়ে এলে। তখন কি কষ্ট হয় নি! আত্মার অপমান হয় নি!

—হচ্ছিল। তাই ননীদাকে খুন করেছি।

—মিথ্যা। ওটা এ্যাক্সিডেণ্ট।

—না! আমার মনে লুকিয়েছিল ওই ইচ্ছা। কোন-না-কোন সময় ওকে খুন করতুমই।

—অথচ ননীদাই তোমাকে এগারো নম্বর লাশের···থাক্। যা হবার হয়েছে। সব ভুলে যাও।

—আমার বড্ড ভয় হয়, মুকুল। ঠিক যেভাবে আত্মার অপমানের জ্বালায় ননীদাকে খুন করেছি, সেই ভাবে কবে না এঁদেরও···

—খুন করে পালাবে, এই তো!

—আমার বড্ড ভয় হয়। সঠিক আত্মপরিচিতি যার জানা নেই, সে বড় সাংঘাতিক মানুষ। মুকুল! আমার সেই রিয়্যাল আইডেন্টিটি হারিয়ে গেছে!

—ওটা এমন জিনিস, একবার খোওয়া গেলে আর মেলে না। এক নদীতে যেমন দুবার স্নান করা যায় না। আঙ্গুলের ছাপের মত প্রতিটি মানুষের নিজস্ব আইডেন্টিটি একেবারে আলাদা। অজস্র মানুষ পৃথিবীতে নিজের সেই আসল কার্ডটি হারিয়ে ডুপ্লিকেট যোগাড় করতে ব্যস্ত। অরিজিনাল আর ডুপ্লিকেট এক নয়, তুমি তো জানো। আবার এও জানো, অজস্র মানুষ অন্যের কার্ড নিয়ে দিব্যি বেঁচে আছে।

—যেমন!

—কবিকে আলুর দর নিয়ে দরাদরি করতে দেখেছি। চোরকে

দেখেছি সন্ন্যাসীর আসনে বসে ঈশ্বরের কথা বলছে। কামুককে দেখেছি সাচ্চা প্রেমিকের কণ্ঠস্বরে ভালবাসার কথা বলতে। এ্যাকাউন্ট্যাণ্ট হয়েছে সাংবাদিক। কেরানী হয়েছে জজ। খুনী হয়েছে দেশপ্রেমিক! বেশ্যা হয়েছে সমাজসেবিকা। অজস্র…অজস্র। পৃথিবী জুড়ে আইডেন্টিটি কার্ডের হাতবদল শুধু।

—সে জন্যেই তো পৃথিবীটা বদলে দিতে হাত লাগিয়েছিলুম, মুকুল।

—আত্মপ্রবঞ্চনা কোরো না। সেও তোমার ফলস্ আইডেন্টিটি। তোমার আসল কার্ড হারিয়ে গেছে বললে না!

—হুঁ। হারিয়ে গেছে বলেছি।

—তাহলে!

—বলো রুণু! চুপ কেন!

—রুণু! তুমি জানো!

—জানি। তোমার মনে পড়ে না রুণু! কিছু মনে পড়ে না। কিছু কি দেখতে পাও না!

—মাঝে মাঝে পাই। অস্পষ্ট। হঠাৎ ভেসে ওঠে, হঠাৎ মিলিয়ে যায়। একটা সকাল, একটা বিকেল—কিংবা সূর্যাস্ত…নদী…নৌকো…সবুজ ঘাস…ধানক্ষেত…

—একটি শিশু আর এক বয়স্ক মানুষ চলেছেন। শিশুটি হাঁটতে চাইছে। সে ছটফট করছে। তাকে বয়স্ক মানুষটি কোলে আঁকড়ে ধরে আছেন। বলছেন—না না! কাদা আছে, কাদা!

—কোথায় যাচ্ছে ওরা!

—কোথাও যাচ্ছে—যেখানে আনন্দ।

—আর অমৃত।

—আর ঈশ্বর।

—ঈশ্বর।

—ঈশ্বরে এসে আমাদের কথা শেষ। আমরা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকি। নিস্পলক।···

—মুকুল! এই মুকুল! শোন্! চাপা গলায় ডাকতে ডাকতে বকুল ঢুকে পড়ে। খুব ব্যস্ত ভঙ্গী! ফিসফিস করে বলে—রিজু এসেছে তোকে দেখতে। রিজু!

হেসে বলি—রিজু! তা এত হই হই করার কী আছে!

—খবর্দার। খুব গ্র্যাভিটি নিয়ে থাকবি।

—তা আর বলতে! দেখিস না কেমন স্মার্ট হয়ে যাব।

—তোকে···তোকে যেন মন-মরা দেখাচ্ছে রে! দেখিস, ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলিস নে।

আমি হেসে ফেলি। বকুল চেয়ারে গিয়ে গ্যাঁট হয়ে বসে—যেন পাহারা দেবে। আমি বিছানায় গিয়ে পা ঝুলিয়ে বসি। সিঁড়িতে জোরে কেউ উঠছে, এমন শব্দ শুনি।

তারপর একটি যুবতী এসে চৌকাঠ এক হাতে ধরে দাঁড়িয়ে যায়। তার গায়ের রঙ বেশ ফর্সা। মুখ লম্বাটে। ফিকে বেগুনী তাঁতের শাড়ি আর চেহারা মিলিয়ে সাধারণ জীবনযাপনের ছাপ রয়েছে। কিন্তু স্বীকার করতে হয়, বকুলের চেয়ে রোগা হলেও সুন্দর। অনেকদিন ঢাকা থাকার পর আলো পেয়ে ঘাস বা গাছকে যেমন দেখায়, তেমনি ফিকে সবুজ প্রাণচ্ছটা। তার ঠোঁটের হাসি আর চোখের দৃষ্টিতে পরিচ্ছন্ন স্মার্টনেস রয়েছে। বকুলের মতো মোটেও গ্রাম্য দেখাচ্ছে না ওকে। ওর বাঁ-হাতে একটা সানগ্লাস দেখা যাচ্ছে। শীতের সকালে সানগ্লাস কেন, বুঝি না।···

বলি—কী রিজু! এস—ভেতরে এস।

রিজিয়া কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে—সিদ্ধান্ত নিতে চায় যেন

কিছু। তারপর খুব ধীরে এগিয়ে আসে। টের পেতে ভুল হয় না যে সিঁড়িতে ওঠার সময় যে গতিবেগ ছিল, তা হঠাৎ ফুরিয়ে গেছে। তার মুখে কোন রঙ নেই। তাহলে কি যা দেখবার আশা ছিল, দেখতে পেল না আমার মধ্যে?

—ছেলেবেলার মুকুলকে দেখবার আশা নিয়ে দৌড়ে এসে থাকলে তুমি নিশ্চয় নিরাশ হবে, রিজু। আমি একটু সিরিয়াস হয়ে বলি।···সেই পুরনো ছাঁচ আর আমার ধঙ্গে খাপ খাবে না। মধ্যে অনেক ঝড়বৃষ্টি গেছে কি না। অনেক ওলট-পালট হয়েছে।

রিজিয়া দাঁড়িয়ে আছে দেখে বকুল চেয়ার ছেড়ে ওঠে।—রিজু, বোসো।—বলে সে বিছানায় গিয়ে বসে।

আমার মনে হয়, বকুলের মনে একটা চক্রান্ত ছিল: হয়তো রিজিয়া দৌড়ে এসে বিছানায় বসে আমার কাঁধে হাত রাখবে কি না দেখতে চেয়েছিল। অন্যকিছুও হতে পারে অবশ্য। তবে এও ঠিক যে বকুলের মধ্যে নীতিবাদিনী গারজেন আছে একজন।

রিজিয়া বসে পড়ে। বকুল হেসে বলে—কী? কথা বলছ না যে? মুকুলকে দেখে খুব ঘাবড়ে গেলে যে।

রিজিয়া আমার দিকে বিকারহীন শুকনো দৃষ্টিতে তাকিয়ে এতক্ষণে বলে—সত্যি! আমি চিনতেই পারছি না একেবারে: কেউ না বলে দিলে চেনা কঠিন।

একটু অস্বস্তি হয়। বলি—তুমি ঠিকই বলছ, রিজু; কিন্তু আমি তোমাকে ঠিকই চিনে ফেললুম!

রিজিয়ার কণ্ঠস্বর নিষ্ঠুর শোনাল।—সে তো বকুল এসে আপনাকে বলেছে···

বকুল বড়-বড় চোখে তাকাল। বলি—আমাকে আপনি-টাপনি কেন রিজু?

রিজিয়ার ঠোঁটের কোণায় একটু হাসি ফোটে। সে আমার প্রশ্নের

জবাব দেয় না। বলে—আমার চেহারা কতটা বদলেছে জানি না, আপনাকে -রিয়্যালি, ভীষণ অচেনা মনে হচ্ছে। জাস্ট ইনটুইশান।...

বকুল দ্রুত প্রতিবাদ করে।—নাও, আরেক কাজী এল!

আমি হো হো করে হাসি। কিন্তু নিজেই টের পাই, হাসিতে জোর নেই। বকুল যদি আধুনিকা—অর্থাৎ সফিসটিকেটেড ধরনের মেয়ে হত, ও বোন হলেপ ওর সামনে অনায়াসে বলে বসতুম—বকুল, প্রেমিকাদের গভীর ইনটুইশান থাকে—হাজার বছর পরেও ঠিক চিনে নিতে ভুল হয় না।

রিজিয়া বলে—আরেক কাজী মানে কি বকুল?

বকুল জবাব দিতে যাচ্ছিল, বাধা দিয়ে বলি—লক্ষ্মী বোনটি আমার! আমার খাতিরে একবার কিচেনে যাও এবং দু-কাপ প্রচণ্ড কড়া চা নিয়ে এস।

রিজিয়া সঙ্গে সঙ্গে বলে—আমি চা খাইনে।

—তাহলে ওর জন্যে কিছু খাবার!

রিজিয়া হাত তুলে বারণ করে।—না বকুল। খেয়ে এসেছি। কিচ্ছু না।

বকুল কিন্তু মুখ টিপে হেসে বেরিয়ে যায়। বুঝতে পারি, ও আড়ি পাতবেই। সিঁড়িতে ওর পায়ের শব্দ মিলিয়ে যাওয়া অব্দি অপেক্ষা করি। তারপর বলি—রিজু, আমি কিন্তু তোমার মুখে অন্য কথা শুনতে চেয়েছিলাম।

—কী কথা বলুন তো?

—স্মৃতি দিয়ে মেলানো কিছু টুকরো কথা—কবিতার লাইনের মতো।

—আগে আমাকে নিঃসংশয় হতে দিন।

চমকে উঠি। বলি—কেন সংশয়, রিজু?

রিজিয়া মাথা দোলায়। চাপা গলায় বলে—কিছু মিলছে না, বিশ্বাস করুন।

তর্কের ভঙ্গীতে বলি—তাই কি মেলে রিজু? সময় আজ কোথায় নিয়ে এসেছে আমাকে।

রিজিয়া মুখ তোলে। স্থির দৃষ্টিতে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বলে—বিশ্বাস করুন! আমার ভীষণ গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। মোটে তো আটটা বছর—নাকি নয়।…

—তাহলে আমি নিরুপায়।

আমি চুপ করে থাকি। রিজিয়াও চুপ করে থাকে। এই স্তব্ধতা অসহ্য লাগে। মুকুলের বাল্য-সঙ্গিনী অথবা প্রণয়িনীর কাছে ধরা পড়ে গেছি—এই বোধটা আমাকে অপমানিত করে। তারপর মনে হয়, একজন নিতান্ত কিশোর এবং এক নিছক বালিকার মধ্যে কী সম্পর্ক থাকতে পারে? আর যাই থাক, তাকে প্রণয় বলা ভুল। অবশ্য তারপর যখন বালিকাটি বড় হয়, তার স্মৃতির মধ্যে কি বাল্যের সহজ মেলামেশাটা প্রেমের জন্ম দিতে পারে?

জানতে চেয়েই বলি—ধরো, আমি সত্যিকার মুকুল নই। আমি…

কথা কেড়ে সে বলে—বলছি না কিছু।

—ধরো, জাস্ট একটা পয়েণ্ট। আমি মুকুল নই। এবার তোমাকে কিছু প্রশ্ন করি। জবাব দেবে তো?

—জবাব দেবার মতো থাকলে দেব।

—তুমি কি মুকুলের প্রতীক্ষা করতে, রিজু?

—গাঁয়ের সবাই করত।

—সেইরকম প্রতীক্ষা? তার বেশি কিছু না?

—কেন এ প্রশ্ন করছেন?

—করছি। একটি ছেলে তোমার সারা ছেলেবেলা ভরে রেখেছিল। হয়তো দুঃখে এবং সুখেই ভরে রেখেছিল। এইরকমই তো হয়। তারপর সে একদিন উধাও হয়ে গেল। তুমি একবারও নিজেকে একা ভেবে দুঃখ পাবে না—সে কি হয়? তুমি নিঃসঙ্গতায় ভুগবে। তারপর যত দিন যাবে…

—তাকে ভুলে যাব। তাই তো নিয়ম

—অসম্ভব।

—আমার মন তো আপনি জানেন না। আমি জানি।

—ধরে নিচ্ছি, তাই। তুমি ভুলে গেলে! কিন্তু সেই ছেলেটিও ভুলে যাবে?

—যাওয়া স্বাভাবিক বইকি। যত দিন যাবে। সে বদলে যাবে—অন্যরকম সিচুয়েশান তাকে বদলে দেবে।

—তা না হতেও পারে। আমিও নিজের মনকে জানি।

রিজিয়া সোজা আমার দিকে তাকায়। দু-চোখে দৃষ্টিটা প্রচণ্ড জ্বলতে থাকে। কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ থাকার পর সে আবার মুখ নামায়। আস্তে বলে—আমার সব গণ্ডগোল লাগছে। কিচ্ছু মেলাতে পারছি না—বিশ্বাস করুন। মুকুল কথা বলার সময় ওর নীচের ঠোঁটে এতটা ভাঁজ পড়ত—ওর চিবুকটা ছিল জোড়া। ওর চোখ দুটোও অন্যরকম ছিল। গলার স্বর যত বদলাক, এমন অচেনা হবে, আমি ভাবতেও পারি নে। বিশ্বাস করুন···

হাসবার চেষ্টা করে বলি—যাঃ। এত বছর আগের ইমপ্রেসন! ভুল থাকতেই পারে। স্মৃতি বড্ড গোলমাল করে ফেলে সব। রাইট ম্যান হয়ে যায় রং ম্যান।

রিজিয়ার মুখে বিষণ্ণতা ফুটে উঠেছে। আড়চোখে তাকিয়ে দেখতে পাই। সে সানগ্লাসটা খুলছে আর বন্ধ করছে। যেন বিশ্বাস-অবিশ্বাসের মধ্যে দোল খাচ্ছে। আমার কথায়—কণ্ঠস্বরে যথেষ্ট দৃঢ়তা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করছি তখন থেকে। হয়তো সেই দৃঢ়তাই ওর দোনামনার কারণ। সে আবার মাথার মাথাটা দোলায়। অস্ফুট বলে—কিচ্ছু বুঝতে পারছি না—বিশ্বাস করুন।

মুখে কপট দুঃখ ফুটিয়ে বলি—তাহলে আমি রং ম্যান। ভুল লোক। ছেড়ে দাও।

—আমি তা বলছি না।

নিজেকে সত্যিকার মুকুল ধরে নিয়েই সত্যিকার জেদে বলি—রাইট ম্যান, তাও বলছ না।

রিজিয়া দুঃখিত স্বরে বলে—আমাকে মাফ করুন।

প্রায় চেঁচিয়ে উঠি—নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই আমার নকল রাগ, ক্ষোভ, দুঃখ আসল হয়ে ওঠে।—তাহলে আমি কে? কে আমি?

পরক্ষণে এই গর্জনবৎ চেঁচানি নিজের কানেই হাস্যকর শোনায়। স্তব্ধতা থমথম করে। বিছানা থেকে নেমে জানলার ধারে যাই। গরাদ চেপে ধরে মাঠের দিকে তাকিয়ে থাকি। মনে জ্বালা নিয়ে ছটফট করি। অন্যের আইডেন্টিটির মধ্যে ঢুকে পড়ে যেন আটকে গেছি চিরকালের মতো। মুকুলের সত্তা পতঙ্গভুক সেই আশ্চর্য উদ্ভিদটির মতো আমাকে গিলে মুখ বুজে ফেলেছে। আর বেরুবার রাস্তা নেই। হজম করে ফেলতে চাইছে আমার রক্ত-মাংস-হাড়—আমার মনকেও। মুকুলের সত্তায় একাকার হয়ে যাচ্ছি। কার একটা অনিবার্য স্রোত আমাকে টেনে নিজের মধ্যে মিশিয়ে নিচ্ছে। দুই নদী এক হয়ে যাচ্ছে!

কতক্ষণ পরে রিজিয়া ডাকে—শুনুন!

মুখ ফেরাই না। বলি—বলুন!

রিজিয়া কি চমকাল আমার সম্ভ্রমসূচক ক্রিয়াপদ শুনে? সে বলে—যদি···যদি আমি আপনাকে স্বীকার না করি, কী আসে-যায় আপনার?

ঘুরে বলি—আসে-যায়। অনেকখানি আসে-যায়।

—মোটেও না। চৌধুরীসাহেব কিংবা বকুল আপনাকে স্বীকৃতি দিয়েছে। তাই তো যথেষ্ট।

—আপনি বড্ড নিষ্ঠুর মেয়ে, রিজিয়া!

—আমাকে মাফ করবেন। আমি যাই।···

তাকে উঠতে দেখে সামনে গিয়ে দাঁড়াই। বলি—আপনার স্বীকৃতি আমি চাই।

রিজিয়া একটু হাসে।—গায়ের জোরে?

—না রিজিয়া, প্লীজ! বলুন, আমি সেই মুকুল।

রিজিয়া আমার মুখের দিকে তাকিয়েই চোখ নামায়। টের পাই, ওর পা-ছুটো থরথর কাঁপছে। আবার বলি—আপনার স্বীকৃতির মূল্য কি আপনি বুঝতে পারছেন না রিজিয়া?

সে মাথাটা একটু দোলায়। তারপর একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলে। তারপর ফিসফিস করে বলে—আমাকে সময় দিন। তারপর আমার পাশ কাটিয়ে দ্রুত বেরিয়ে যায়!···

অমনি বকুল এসে ঘরে ঢোকে। তার হাতে চায়ের কাপ—প্লেট চাপানো, পাছে জুড়িয়ে যায়। জানি, ও সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে কথা শুনছিল। এসেই বলে—জানতুম, ও গোলমাল করবে। আমার কথা ফলল তো?

—ফলল রে!

—কিন্তু তুই ওকে কোন্ আক্কেলে আপনি-টাপনি করলি, শুনি?

—ও আমাকে আপনি-টপনি করল, তাই।

বকুল তখনই সায় দিল—ঠিক করেছিস। তুমি অচেনা সাজবে, আমিও তাহলে সাজি।

—হুঁ, সেজন্যেই তো।

—ত্যাখ, চা জুড়িয়ে গেল নাকি।

ওর হাত থেকে চায়ের কাপ নিয়ে চুমুক দিই। বলি—নাঃ, গরম আছে।

বকুল রাগ দেখিয়ে সশব্দে চেয়ারে বসে বলে—দেখিস, আবার ও আসবে। বারে বারে আসবে আর ঢঙ করবে। ওর ন্যাকামি দেখলে আমার মাথায় আগুন জ্বলে যায়। খবর্দার, ওকে পাত্তা দিবি নে।

—রিজু আমাকে মুকুল বলে মানতে পারল না, বকুল!

—এ তো জানা কথা। মানলেই তো তোকে বিয়ে করতে হবে—বুঝতে পারছিস নে? কিন্তু ও পছন্দ করেছে সান্নুকে। হুঁঃ। কাজীসাহেব ওকে বউ করবে! দেখবি—কী অবস্থা হয়! নাড়ুমিয়ার মেয়ের মতো আইবুড়ো থেকে চুল পাকাবে।

আমি হাসতে গিয়ে গলায় চা আটকে গেল বকুল উদ্বিগ্ন মুখে উঠে দাঁড়াল। কাসতে কাসতে বললুম—যাক্ গে। এবার মামুজী এসে আবার কি বলেন, দেখা যাক!

বকুল বলল—মামুজী? মামুজী কারুর মতো গরু-কেনা পাইকার নয় যে খোঁচা মেরে মেরে পরখ করবে—শিঙ ভাঙা, না খুঁড়িয়ে হাঁটে।

ওর গ্রাম্য উপমাটা ভারি জুতসই। অস্বস্তি কেটে যেতে দেরি হয় না। কিন্তু রিজিয়া মনে কোথাও একটা কাঁটা বিঁধিয়ে দিয়ে গেল। ফোঁটা-ফোঁটা রক্ত পড়ছে কি? চিনচিন করে ব্যথাটা। সত্যিকার মুকুল কী করতো—সেই ভাবনা আমাকে গিলে খায় এবার।...

দীর্ঘশ্বাস ফেলে মনে মনে বলি—আট বছর। মুকুলের আটটা বছরকে এ বাড়ির তিনটি মানুষ স্বীকার করে নিয়েছে সঙ্গে সঙ্গে। আট বছরের ব্যবধানে একজন কিশোরের কণ্ঠস্বর অনেক বদলে যায়। প্রথমে ভাঙে, তারপর গড়ে ওঠে নতুন পর্দায়। তবু কি কিছু থাকে না পেছনের—যা সঙ্গে সঙ্গে চিনিয়ে দেয়? অন্ধ বৃদ্ধ শোকগ্রস্ত বিপর্যস্ত মানুষ। সারাক্ষণ ঈশ্বরের ধ্যানে নিবিষ্ট দেখছি তাঁকে। তাঁর ভুল হতে পারে। মায়মুনা নামে এ বাড়ির ঝি—তার চোখে ছানি, কানেও ভাল শোনে না—তারও ভুল হবে। আর বকুল? বকুলেরও তো ভুল হলো। কেন তার মনে সংশয় জাগছে না? তাহলে কি বকুল এমন কিছু পেয়ে গেছে আমার মধ্যে, যার জন্যে ওর আটটা বছর মাথা কুটে মরছিল? বোকা মেয়ে, হারানো খেলনার হরিণের বদলে

খেলনার ঘোড়া পেয়েই যেন ভুলে গেছে। খেলনা হলেই হল। বোকা, বোকা!

আর রিজিয়া ছিল মুকুলের বাল্যসঙ্গিনী। মুকুলের যখন ষোল বছর বয়স, তখন মুকুল নিরুদ্দিষ্ট হয়েছে। ষোল বছর বয়স! বার বার কথাটা মাথায় ঘুরতে থাকে। ষোল বছর—ষোল বছর! …তখন সবে যৌবনের কয়েকটা দরজা খুলছে। অন্যরকম আলো এসে পড়েছে সেই দরজাগুলো দিয়ে।

এইসব আলো পড়েছিল মুকুলের মুখে—তার শরীরে, এবং মনেও। তার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল রিজিয়া। বারো-তের বছরের একটি বালিকা। কিছু কি ঘটেছিল তখন?

হয়তো ঘটেছিল। তাছাড়া রিজিয়ার এ আচরণের কোন মানেই হয় না। দুরন্ত দুর্ধর্ষ এক কিশোরের হঠকারী কোন চুম্বন—নাকি তারও বেশি কিছু!

মুকুলের ছবির সামনে যাই। প্রশ্ন করি। কী ঘটেছিল, মুকুল?

মুকুল মুখ টিপে হাসে।—কী ঘটতে পারে, তুমিই ভেবে নাও।

—আমার ধারণা নেই। এটা তো পাড়াগাঁ।

—হুঁ, বকুলতলা পাড়াগাঁ-ই। তাই নির্জন বাগান আছে। আগাছা ভরা পোড়ো জমি আছে। খুব কাছেই আছে এক নদী। ভাগীরথী।

—এখনও দেখি নি। স্টেশনের পয়েন্টসম্যানের বোন মালতী বলেছিল।

—ওপারে ঘাটের ওপর আমিনগঞ্জের বাজার। টাউনশিপ। মেলা বসেছে।

—হ্যাঁ, মালতী বলেছিল। মালতীকে তুমি চেন না। সে বকুলের মতো ভালো—খুব ভাল মেয়ে। আবার তাকে দেখতে যাব।

—মালতীর কথা থাক। রিজিয়া।

—হ্যাঁ রিজিয়ার কথা বলো।

—রিজিয়া আমাকে ভালবাসতো। ওর মুখ দেখেও কি বুঝতে পারো নি বোকা? ও যখন ওই দরজায় এসে দাঁড়াল—ওর মুখে কী বিশাল প্রত্যাশা মুহূর্তে কুয়াসার মতো মুছে গেল, লক্ষ্য করো নি? সে যাকে দেখতে চেয়েছিল, তাকে পেলো না!

যদি তুমিই আট বছর পরে ফিরতে, তোমার মধ্যে কি ষোল বছরের প্রেমিককে দেখতে পেত, ও? মানুষ বদলে যায় প্রতিদিন—জানো না?

—তবু কিছু থাকে, যা বদলায় না। হাজার বছর পরেও চিনতে ভুল হয় না।

—রিজিয়ার বুঝি সেই চোখ আছে?

—আছে। প্রেমিকাদের থাকে।

—'পাখীর নীড়ের মতো চোখ।'

—'পাখির নীড়ের মতো চোখ!'

অনেকক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে থাকি। তারপর হতাশ হয়ে সরে আসি। জানলার ধারে যাই। ঘুরে হলুদ ধানক্ষেতের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ চমকে উঠি। চোয়াল আঁটো হয়ে যায়। মালতীর কাছে কাল সকালে দাঁড়িয়ে থাকার সময় যা দেখেছিলুম, আবার সেই অতিলৌকিক দৃশ্য। বিস্ময়কর সব নীল রঙের হাজার হাজার ঘোড়া ডিসেম্বরের হলুদ মাঠে এসে দাঁড়িয়েছে। ধান কাটতে কাটতে চাষারা কাস্তে দিয়ে পিঠ চুলকোচ্ছে, আর হঠাৎ ওই অলীক উপদ্রবে তাদের হাত থেমে গেল। হাজার হাজার নীল রঙের ঘোড়ার খুরের আঘাতে উৎক্ষিপ্ত শস্যকণা আকাশ ঢেকে ফেলল। হাজার হাজার নীল ঘোড়ার হ্রেষাধ্বনিতে বিশাখার হানড্রেড মাইলস্ চলার তীব্র ডাক ঝড়ের মতো এক বেজে ওঠা বিশাল অর্কেস্টায় বিচ্ছুরিত করতে থাকল নীল-নীল বিদ্যুৎ।

দু-হাতে চুল খামচে ধরে চেঁচিয়ে উঠি—আমি যাব। আমি যাব আমাকে ছেড়ে দাও।···

চোখ খুলি এবং উঠে বসার চেষ্টা করি। কে আমাকে জোর করে শুইয়ে দেয়। কে চাপা গলায় বলে—আরেকবার মাথা ধুইয়ে দিলে হতো!

তার দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকাই। বলে উঠি—তুমি বিশাখা?

আমার দু-চোখে কার একটা ভারি হাত পড়ে। গম্ভীর তার কণ্ঠস্বর। সে বলে—চুপচাপ শুয়ে থাকো। তাকিও না। ডাক্তার ডাকতে পাঠিয়েছি।

হাতটা সরিয়ে দিয়ে বলি—আমাকে ছেড়ে দিন আপনারা। আমি চলে যাব।

সেই অচেনা কণ্ঠস্বর শুনি।—কোথায় যাবে বাবাজী? আগে সুস্থ হও—তারপর তো সে কথা!

ওঁর মুখের দিকে তাকাই। প্রৌঢ়, প্রকাণ্ড চেহারার এক মানুষ! মুখে মস্তো গোঁফ—ঠোঁটে অমায়িক হাসি। একটু হেসে বলি—মামুজী?

ভদ্রলোকের চোখে একটু বিস্ময় ফোটে। পরক্ষণে উনি হেসে বলেন—হ্যাঁ ঠিকই চিনেছ বাবাজী।

—জল খাব, মামুজী।

—ও বকুল, পানির গেলাসটা দে।

বকুলকে দেখতে পাই এতক্ষণে। ভিজে চোখ—আলুথালু চুল বিস্রস্ত চেহারা। ঝড়ে বিপর্যস্ত গাছের মতো। নিঃশব্দে জলের গ্লাস এগিয়ে দেয়। মামুজী বলেন—আব্বাকে বলে আয় রে জ্ঞান ফিরেছে। বকুল আমার দিকে একবার তাকিয়ে বেরিয়ে যায়।

জল খেলে গ্লাসটা মামুজী হাতে নেন। পাশের টেবিলে রাখেন। তারপর বলেন—যাক্ গে, মরুক গে। এখন চোখ বুজে থাকো। চোখ খুললেই তো আবোল-তাবোল দেখবে। কাকে কি বলে বসবে।

মামুজী হেসে ওঠেন জোরে। আমি বলি—আমার কী হয়েছিল ?

—কী হয়েছিল তুমিই জানো বাবাজী। ঘোড়া-ঘোড়া করছিলে ঘোড়ারোগ ছাড়া আর কি! এখন সুস্থ বোধ করছ তো ?

—হুঁউ।

—মাথায় তো অনেক ঘা দেখলুম। মাথার ঘায়ে কুকুর-পাগল বলে কথা আছে। পাগল হও নি, এই বাঁচোয়া।…মামুজী পকেটে হাত ভরে একটা কৌটো বের করেন। তারপর দেখি খৈনি ডলছেন। ডলতে ডলতে হঠাৎ চাপা স্বরে বলেন—তা ইয়ে, বাবাজীর আসল নামটা কী ? ঠিকানাই বা কী ? এঁ্যা ?

সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীর অবশ হয়ে যায় কয়েক মুহূর্তে। নিষ্পলক তাকাই।

—না, না! ভড়কে যেও না! যা হবার, তা তো হয়েইছে। তবে কি জানো, দুম করে কাকেও গাছে তুলিয়ে মই কেড়ে নিতে নেই। চৌধুরীসায়েব এক ধাক্কা খেয়ে তো অর্ধেকখানা হয়ে গিয়েছিল। আবার তুমি এসে আচমকা আরেক ধাক্কা মারলে। বোঝ অবস্থা! একে তো হার্টের গতি ভাল নয়।

দু-হাতে মুখ ঢেকে বলি—আমাকে ক্ষমা করুন!

—নাও! এত ভয় পাবার কিছু নেই রে বাবা। সংসারে এমন হয়। সুস্থ হও—সব শুনব'খন। যদি ধরো, তুমি সত্যি সত্যি আমার ভাগ্নে মুকুলই হতে! এঁ্যা ? অবিকল এক চেহারা—একরকম কথা বলার ভঙ্গী। ধরে সাধ্য কার ? এসেই দেখেশুনে তো আমি হতবাক। ফিটের ঘোরে তখন তুমি এনতার বকে যাচ্ছ! বকুল হাঁউমাউ করে চেঁচাচ্ছে। সে এক কাণ্ড!

…বলে মামুজী খৈনিটা জিভের তলায় রাখলেন। হাত ঝেড়ে রুমাল বের করে মুছলেন। তারপর চোখ নাচিয়ে বলেন—তিরিশ বছর সাবরেজিস্টারি করেছি। রিটায়ার করে নানা দেশে ঘুরেছি। কত অবাক অবাক কাণ্ড দেখেছি। কিন্তু এমনটি কখনও দেখি নি রে

বাবা! যাক্ গে, মরুক গে। ডাক্তারসায়েব আসুক। ওষুধপত্তর খাও। ইয়ে—ছেলেবেলা থেকে, নাকি সম্প্রতি বাধিয়েছ?

প্রশ্ন করতে তাকাই। কিছু বলি না।

—মৃগী। মানে এই তোমার এপিলেপ্সির কথা বলছি।

—আমার মৃগীরোগ নেই।

—নেই বললে কি চলে? একটু অন্যরকম এপিলেপ্সি—যাতে হ্যালুসিনেশান হয়। তুমি তো বাবাজী নীল রঙের ঘোড়া দেখছ? কতজন ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর সব জিনপরী রাক্ষস-খোক্কস থাকে! ছেলেবেলায় আমাদের পাশের বাড়ি একটা লোক ছিল। তার নাম দুখু। সে দেখতুম, দিব্যি সজ্ঞানে পরী দেখতে পেত। আকাশের দিকে তাকিয়ে বলতো—কোথায় যাচ্ছ গা? ফেরার সময় দেখা করে যেও। তার বউয়েরও একই ব্যারাম ছিল। সে আবার এক কাঠি সরেস। আমাদের রূপকথা বলতো। বলতে বলতে হঠাৎ দেখি অন্ধকার ঘরে কার সঙ্গে দিব্যি কথা বলতে শুরু করেছে। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!

মামুজী দুলে দুলে হাসেন। তাঁর প্রকাণ্ড ভুঁড়িটি দুলতে থাকে। মানুষটিকে চিনতে দেরি হয় না। আশ্বাস পাই যেন। সব অস্বস্তি কেটে যায়। বলি—ওদের কথা আরও বলুন, মামুজী!

উনি আমার দিকে একবার তাকান। তারপর মুখটা গম্ভীর হয়ে ওঠে। অন্যদিকে ঘুরে ভাঙ্গা গলায়, একটু কেসে, যেন নিজেকে সামলে নিয়ে, খুব আস্তে বলেন—আশ্চর্য! মুকুল ঠিক এমনি করে বলতো। অবিকল!···তারপর একটা ভারি দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথাটা সামান্য দোলান—যেন হতাশায়। জিভে চুকচুক শব্দ করেন কতক্ষণ।···

সি / নয়

কতক্ষণ স্তব্ধতা। তারপর ডাকি—মামুজী!

—উঁ?

—বকুলকে কি বলেছেন আমি তার ভাই মুকুল নই?

মামুজী হঠাৎ ঘুরে ঠোঁটে আঙুল রাখেন এবং তাঁর দৃষ্টিতে দাউ-দাউ আগুন জ্বলে। কিন্তু ফিসফিস করে বলেন—চুপ।

—চৌধুরীসায়েবকে বলেন নি?

মামুজী ফেটে পড়েন। শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে মিশিয়ে ফের বলেন—চুপ্, হতভাগা!

—কেন ওদের বলেন নি?

মামুজীর বড় বড় ফ্যাকাসে চোখের ঘোলাটে তারার আগুন ছাপিয়ে বাষ্প ওঠে। জলকণা ফোটে। আস্তে বলেন—বুদ্ধু বুড়বাক্ কাঁহেকা! জানিস না কেন বলি নি?

—কিন্তু আমি তো একজন প্রতারক। জাল-জুয়াচুরি করছি। আমাকে কেন সহ্য করছেন, মামুজী? কেন এখনও ধরিয়ে দিচ্ছেন না, সব টের পেয়েও?

মামুজী মেঘের মতো আওয়াজ দিয়ে বলেন—তুই থামবি?

চুপ করে থাকি। আবার কতক্ষণ স্তব্ধতা এসে ঘিরে ধরে আমাদের দু-জনকেই। তারপর আপন মনে বলি—বকুল হয়তো টের পেয়ে গেছে এখন। তাই আসছে না।

চাপাস্বরে মামুজী শাসিয়ে বলেন—তুই না বদলালে তোকে জবাই করব। খবর্দার! যেমন আছিস, তেমনি থাক্। যা করার আমায় করতে দে।

—কেন?

মামুজীর দৃষ্টিতে যেন অসহায়তা ফুটে ওঠে। ইংরেজীতে বলেন —দিস ইজ এ ভেরি পিকিউলিয়ার হিউম্যান প্রব্লেম! তোকে আমি বোঝাতে পারবো না—তুই কি করে ফেলেছিস। তুই যেই হোস, এখন আমি যদি কোন হঠকারিতা করে ফেলি—দু-দুটো মানুষের লাইফ নিয়ে টানাটানি হবে! হার্টের রুগী একজন। অন্যজন নিতান্ত গোবেচারা মেয়ে। তাতে বয়স কম, মাথায় ঘিলুই নেই। বেমক্কা ঘা খেয়ে ঝোঁকের বশে…খোদা হাফিজ! খোদা হাফিজ!

উনি যেন শিউরে ওঠেন। চোখ বুজে শরীর ঝাঁকিয়ে কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ বসে থাকেন। তারপর চাপা গলায় ফের বলেন—মুশকিল হয়েছে এই যে তুই ব্যাটা একেবারে মুকুলের মতো দেখতে। আবার তেমনি খামখেয়ালী আর ডানপিটে। তেমনি মাথাভর্তি ছিট হু-বহু এক।

…বলেই দ্রুত উঠে গিয়ে দরজায় একবার উঁকি দেন। তারপর ফিরে আসেন। বকুল আড়ি পেতেছে কিনা তাই দেখে এলেন নিশ্চয়।

—কিন্তু যে উদ্দেশ্যেই মুকুল সেজে ঢুকে থাকিস, সোজা বলছি…

বাধা দিয়ে বলি—একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল কিছুক্ষণের আশ্রয়। একটা বিছানা, কিছুক্ষণ ঘুম আর কিছু খাবার। বিশ্বাস করুন, মুকুলের কথা কিচ্ছু জানতুম না। গাঁয়ের লোকগুলো হঠাৎ আমাকে গেটের পাশে রাস্তায় দেখেই চেঁচিয়ে উঠল মুকুল বলে।

মামুজীও আমার কথায় বাধা দেন। বলেন—শুনেছি! মানুষের বাচ্চা হলে সব সত্যিকথা বলবি! মিথ্যে বললে আমি কিন্তু টের পাবো। তারপর কি করবো জানিস? বিসমিল্লা বলে জবাই করবো।

—তবে শুনুন।

—চুপ বেতমিজ্। সব শুনব—ওবেলা। নদীর ধারে গিয়ে। এখন সে সব কথা নয়। ডাক্তার আসুক।

—কে ডাক্তার? গাঁয়ের?

—না রে বাবা! বকুলতলায় ডাক্তার কোথায়? এতকাল বাদে নাকি কাজীর ব্যাটা সামু ডাক্তারী পড়তে গেছে কলকাতায়। ডাক্তার একজন আছে—সে নদীর ওপারে আমিনগঞ্জে। সেও এল-এম-এফ। সরকারী হাসপাতাল আছে একটা টুটা-ফাটা। আর বলিস নে। বকুলতলার মিয়ারা এতকাল শুধু পোলাও-কোর্মা খেয়ে আর নিকে করে গণ্ডায় গণ্ডায় বাচ্চার জন্ম দিয়েই কাটিয়েছে। শুধু এই চৌধুরী ফ্যামিলী-ই বরাবর এনলাইটেণ্ড। আমার ভালুই সায়েব ছিলেন খানবাহাদুর। জমিদারী ছিল ছোটখাট। সে বিস্তর কথা। তুই শুনে কী করবি।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা যায়। এতক্ষণে বুঝি বকুল আসছে। সে এতক্ষণ কোথায় ছিল ভেবে পাই নে। দরজায় তাকে দেখতে পাই। মুখটা উদ্বিগ্ন। বলে—মামুজী, কই আসছে না তো ডাক্তার।

মামুজী একটু হেসে বলেন—তুই বুঝি রাস্তার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিলি?

বকুল মাথা দোলায়। আমি বলি—আমি সেরে গেছি, বকুল।

বকুলের মুখের গাম্ভীর্য তবু কাটে না। সে এসে আমার পায়ের কাছে বসে পড়ে। আড়চোখে আমাকে দেখতে থাকে। আমি ফের বলি—আমার এই রোগটা মাঝে মাঝে ওঠে। আপনি-আপনি সেরে যায়। এ কিছু না।

তারপর উঠে বসি। মামুজী চোখ নাচিয়ে বলেন—মা বকুল-ফুল! আমার কিন্তু বেজায় খিদে পাচ্ছে। কোর্মার গন্ধ পাচ্ছি। কিন্তু গন্ধটা কেমন পোড়া-পোড়া। অতএব বোঝা যাচ্ছে, মায়মুনা-বুড়ি একটা সর্বনাশ পাকাচ্ছে। অতএব মা বকুলফুল, তুমি বুড়িকে সামলাও গিয়ে।

বকুল ম্লান হেসে আমার দিকে তখনকার মতো করুণ দৃষ্টি ফেলে যেন অনিচ্ছা সত্ত্বেও চলে গেল!...

—বেচারাকে তাড়িয়ে দিলেন মামুজী।

—তাড়িয়ে দেব না তো তোমার মতো বাইরের একজন পুরুষ-মানুষের সামনে পর্দানশীল মেয়ে বসে থাকবে? কি ভেবেছ। হে ছোকরা?

কথাটা শুনেই চমকে উঠেছিলুম—কিন্তু দেখি মামুজীর চোখ দুটো কৌতুকে জ্বলজ্বল করছে। ঠোঁটে চাপা হাসি রয়েছে। ফের বলেন—তুমি নির্ঘাৎ হিন্দু! খান্দানী মুসলীম ফ্যামিলীর ব্যাপার-স্যাপার জানো না।

—জানি। আমার ইকবাল নামে এক বন্ধু আছে। ওদের বাড়ি আমি প্রায়ই যাই। মুসলমানী কথাও বলতে পারি।

—তোমার পেটে অনেক আছে। এখন চেপে থাকো হে।

—ইকবালের কথা বকুলকে বলেছি। পরশু সন্ধ্যা থেকে কাল সকালে এখানে আসা অবধি যা-যা করেছি, সব সত্যি-সত্যি ওকে বলেছি।

—তুমি যখন মড়ার মতো পড়েছিলে, বকুল বলেছে!

—বলেন কি।

—আরে বাবা। এ আমার স্বভাব। তোমার হাল-হদিস সত্যি-মিথ্যে যাই হোক, বকুলকে যা-যা বলেছ, সব ও আমাকে বলেছে।

—আপনি আর তুই বলছেন না, মামুজী!

মামুজী জবাব দেন না হঠাৎ যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেছেন। ফের খৈনির কৌটো বের করেন উনি। কিন্তু খোলেন না—হাতে নিয়ে বসে থাকেন। দৃষ্টি মেঝের দিকে।

—মামুজী!

—উ?

—কি ভাবছেন?

—মুকুলের কথা। মুকুলকে খাতির করে মাঝে মাঝে তুমি বলতুম। বড় হচ্ছিস তো। আর তুই বলতে বাধত। আর—তখন ঠিক অমনি করে সে বলতো…আঃ! খোদা হাফিজ!

একটু চুপ করে থাকার পর বলি—আমি যদি সত্যি মুকুল হতুন!

যেন গভীর পরিতাপে মাথাটা একটু দোলান মামুজী। জিভে চুকচুক শব্দ করেন। তারপর দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে বলেন—হ্যাঁ! কিন্তু তা তো হবার নয় রে বাবা!

—মামুজী! দেখবেন, একদিন না একদিন সে ফিরে আসবেই। তখন আমি যেখানেই থাকি—যদি জেলে কিংবা···কিংবা পরলোকে, আমি টের পেলে একবার এসে ওকে দেখে যাবই যাব।

মামুজী তখনকার মতো চাপা গর্জান।—চুপ। আর ন্যাকামি করতে হবে না। নিজের চরকায় তেল দে।

খিক খিক করে হেসে উঠি। উনি ফের ধনক দিতে গিয়ে আমার দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে থাকেন। আমি গড়গড় করে বলে যাই—রেলের পয়েন্টসম্যানের বোন মালতী আমাকে নোট পোড়াতে দেখেছে। রিভলবার ফেলতে দেখেছে জলে। তাকে অপমান করে এসেছি! আর স্টেশনের ওখানে একটা বেওয়ারিস গাড়ি··· ননীদার লাস।···পুলিস আসবেই। আমাকে ধরে নিয়ে যাবে। থানার বারান্দায় এগারো নম্বর মিসিং বডির ছবি টাঙানো রয়েছে। আমাকে···

মামুজীর একটা হাত থাবার মতো আমার মুখে পড়ে। ছাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করি। পারি না। মামুজী ফিসফিস করে বলেন—চুপ! চুপ! খোদার দোহাই—তোমাদের দেবদেবীর দোহাই! তুই থাম্ বাবা! তুই জানিস না, এ বাড়ির তলায় এখন ডিনামাইট।

একটু পরে হাত তুলে নেন। আমি বলি—আমাকে ক্ষমা করুন মামুজী।

মামুজী কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন। তারপর ভাঙা গলায় বলেন—ওরে হতভাগা। নিজের জান বাঁচাতে এসে দু-দুটো জান নিয়ে খেলা করতে গিয়েছিলি। এখন কীভাবে সামলাবো, ভাবতে দে।

ভিজে চোখদুটো রুমাল বের করে মোছেন উনি। তারপর ফের বলেন—শোন্। দু-কুল যাতে বাঁচে, চেষ্টা তো করি। তুই আপাতত মুকুল হয়েই থাক। বুঝলি? পুলিশ যদি আসেই, আমি সামলাবার চেষ্টা করব। তুই কিন্তু বেফাঁস কিছু বলে বসবি নে। কেমন?

এইসময় বকুল সিঁড়ি বেয়ে প্রায় দৌড়ে আসে। হাঁফাতে হাঁফাতে বলে—ডাক্তারবাবু এসে গেছেন।

মামুজী জানলায় উঁকি মেরে দেখে আসেন? আমিও দেখি। লনে সাইকেল থেকে নামছেন ভদ্রলোক। মোটা নাদুসনুদুস ডাক্তার, সাদা প্যান্টশার্ট পরনে। গলায় স্টেথিসকোপ। সাইকেলের কেরিয়ারে ডাক্তারী বাক্সো।

বকুল নিচে চলে যায়। আমরা ডাক্তারের অপেক্ষা করি। মামুজী চাপা গলায় বলেন—সাবধান! অন্য কথা নয়। কোনরকম বেফাঁস বলবিনে। ডাক্তারবাবু মুকুলকে কখনও দেখেন নি। সবে বছরখানেক এসেছেন।......

স্টেশন থেকে নীচের সড়কটা বকুলতলার দক্ষিণ ঘেঁষে চৌধুরী বাড়ির গেটের পাশ দিয়ে সোজা গঙ্গার ঘাটে নেমেছে। খেয়া নৌকায় পারাপার হচ্ছে। ওপারে ছোট বাজার ভিড় আর ইটের অজস্র একতালা বাড়ি দেখা যাচ্ছিল। সন্ধ্যার একটু আগে মামুজী আমাকে নিয়ে বেরিয়েছেন। ঘাটের কাছে গিয়ে বাঁ-দিকে বাঁধে উঠেছি আমরা। নির্জন বাঁধে কিছুদূর এগিয়ে তারপর বসেছি। ওপারে দিগন্ত অবধি ফাঁকা হলুদ ফসলের মাঠ। সূর্য ডুবছে। পাশে আবার সেই নীল ঘোড়াগুলো দেখতে পাই, সেদিকে তাকাচ্ছি নে। নদীর জল দেখছি। শীত একটু করে বাড়ছে। এরই মধ্যে কুয়াসা এসে গাছপালা ঢেকে ফেলছে।

মামুজী পাঞ্জাবির ওপর একটা শাল জড়িয়েছেন। একহাতে

হনুমান টুপি রয়েছে। অন্যহাতে একটা কালো ছড়ি। ছড়ি দিয়ে শুকনো ঘাসে মৃদু আঘাত করছেন।

দু-জনেই চুপচাপ। আমি ডাক্তারের কথা ভাবছি। ডাক্তার দিব্যি বলে গেলেন—জন্মগত মৃগী! এটাই আশ্চর্য লাগছে! আমার তো কখনও ফিটের অসুখ ছিল বলে মনে পড়ছে না। কখনও হ্যালুসিনেশান দেখিনি। দেখিনি ওই নীল ঘোড়াগুলো। পরশু সন্ধ্যায় কলকাতার একটা বারে দেওয়ালে আঁকা রাজপুত অশ্বারোহীকে দেখার পর থেকে যেন চোখের মধ্যে একটা ঘোড়ার জলছবি ঢুকে গেছে। সেই একটা জলছবি থেকেই হাজার হাজার ঘোড়া প্রতিফলিত হচ্ছে যেন। দ্রুত একটার পর একটা জলছবির ছাপ পড়ে যাওয়া!

—হুঁ, যৌবনে ভাওয়াল সন্ন্যাসীর কথা শুনতুম। খুব বড় মামলা হয়েছিল! সেইরকম ব্যাপার!…মামুজী খুক খুক করে হাসেন। তারপর চোখ নাচিয়ে বলেন—কি বাবাজী? চৌধুরীর সম্পত্তির লোভ-টোভ মনে নেই তো? থাকলেও সে গুড়েবালি। সামান্য ক বিঘে জমি, একটা পুকুর, একটা বাগান—ব্যস! বকুলের বিয়ে দিতেই তা খসে যাবে। আজকাল আমাদেরও পণের কারবার চলছে কিনা। একেবারে উল্টো।

জোরে মাথা নেড়ে বলি—আমি থাকতে আসি নি, বিশ্বাস করুন।

—তবে চলে যাওনি কেন? শেকড় গজাবার তালে ছিলে কেন?

—ঠিক যেজন্যে আপনি এখনও আমাকে মুকুল বলে চালাচ্ছেন, সেজন্যেই। এক অসহায় অন্ধ বুড়োমানুষ আর একজন সরলমনা মেয়েকে ফেলে……

—তোমার যদি এত সেন্স, তাহলে…তাহলে মানুষ খুন করতে কেন? হাত কাঁপতো না?

—আমি মানুষ খুন করিনি মামুজী, জানোয়ারদের জবাই করেছি।

—রাখো! শুধু মুখে বড়-বড় বুলি! মারধোর খেয়ে তো ঝাঁঝরা হয়ে রয়েছো। আর বীরত্ব ফলিও না। সব বোঝা গেছে!

মামুজী খৈনির কৌটো বের করেন। আপন মনে খৈনি ডলতে থাকেন। কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর বলি—আপনি আমার সব কথা শুনবেন বলে ডেকে নিয়ে এলেন!

হুঁ, শুনব। শোনা দরকার। তার আগে তোমাকে কিছু বলতে চাই।

—বেশ তো। বলুন!

মামুজী খৈনি ডলতে ডলতে বলেন—বাবা আর বোনের চোখকে ফাঁকি দিতে পারলে—শুধু দু-এক মিনিট নয়, একদিন একরাত! অথচ আমি এসেই ধরে ফেললুম। তাই না?

—হ্যাঁ। আপনি অভিজ্ঞ মানুষ।

মামুজী অধৈর্য মানুষের মতো বলে ওঠেন—বাবা আর বোন ধরতে পারল না—আর মামা হয়ে ধরে ফেললুম কীভাবে, ভেবে দেখেছ? অভিজ্ঞ মানুষ কোন কথা নয়। তোমাকে দেখে বা তোমার সঙ্গে কথা বলেও কারও সাধ্যি নেই যে ধরে 'ইউ আর এ রং ম্যান'।

—মামুজী! খোনকারসায়েবের মেয়ে রিজিয়া ধরে ফেলেছে!

মামুজী গুম হয়ে যান। তারপর বলেন—ও! ধরেছে?

—হ্যাঁ।

—কি বলল?

—বলল, আমাকে রেকগনাইজ করতে ওর সময় লাগবে। ওর স্মৃতির সঙ্গে মিলছে না নাকি। শুনেছি রিজুর সঙ্গে মুকুলের সম্পর্ক ছিল। বিয়ের কথাও ছিল।

মামুজী মাথাটা দুলিয়ে বলেন—ওটা কথা নয়। সত্যি সত্যি মুকুল ফিরে এলেও রিজুর একটা প্রব্লেম হতো। আসলে কি জানো? মানুষের মন ওই নদীর স্রোতের মতো। একখানে দাঁড়িয়ে নেই। নদীর ধারে এই যে খানিকটা বাঁক দেখছ, স্রোতটা ঘুরপাক খাচ্ছে

—কিন্তু কতক্ষণ? ঘুরপাক খেতে খেতে একটা সময়ে জল আবার গিয়ে মাঝখানের স্রোতে মিশছে। ওই শুকনো পাতাটা তখন থেকে ঘুরপাক খাচ্ছে, লক্ষ্য করো।···ওই দ্যাখ, বেরিয়ে গেল! বাবাজী, এটাই নিয়ম।

—বেশ। আপনি কিভাবে চিনলেন তাই বলুন।

মামুজী খৈনিটা মুখে ফেলে পশ্চিমের দিগন্তে কিছুক্ষণ দৃষ্টি রাখলেন। সূর্য আর নেই। লাল রঙটাও দ্রুত ফিকে হয়ে যাচ্ছে। ঘন কুয়াসা জমছে।

মামুজী!

হঠাৎ লক্ষ্য করি, ওঁর চোখ থেকে জলের ধারা নেমে গাল ভেসে যাচ্ছে। গোঁফের দু-ধার ছুঁয়ে ফেলেছে সেই নিঃশব্দ স্রোত। তারপর উনি আস্তে বলেন—যখন খবর পেলুম মুকুল ফিরেছে—তখনই জানলুম কোন জ্বালে মুকুল খারাপ মতলব নিয়ে চৌধুরীবাড়ি ঢুকেছে। ভয় হল। অন্ধ বুড়ো—আর ওই বোকা মেয়ে! পৌঁছে হয়তো শুনবো—কোন সাঙ্ঘাতিক বিপদ হয়ে গেছে। তখনই বেরিয়ে পড়লুম। কিন্তু এসেই তোমাকে দেখে আমারও কয়েক মুহূর্ত ধন্দ লেগে রইল। নিজের চোখ দুটোকে বিশ্বাস করতে পারলুম না। তুমি তখন অজ্ঞান হয়ে রয়েছ। বকুল কোলে তোমার মাথাটা নিয়ে শুধু কান্নাকাটি করছে। আমি অবশ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। তাহলে আট বছর আগে যা নিজের চোখে দেখেছি, তা কি চোখের ভুল? তা কি নিতান্ত দুঃস্বপ্ন? নাঃ—অসম্ভব।

—কী মামুজী, কী?

—মুকুল ওর মাকে ঢিল ছুঁড়ে মেরে পালিয়ে গিয়েছিল। সারাদিন স্টেশনে ঘোরাঘুরি করে রাতে বাড়ি এসেছিল। কাউকেও জানতে দেয় নি। হতভাগা সারারাত নাকি বাড়ির কাছে এসেছে, আবার এদিক-ওদিক ঘুরেছে—কিন্তু ঢুকতে সাহস পায় নি। তারপর কান্নাকাটি শুনে টের পেয়েছে সব। শেষ রাতে ওর মা

মারা গেল। এমনি দিশেহারা হয়ে সে পালিয়ে সোজা আমার ওখানে উঠল। তখনও আমি রিটায়ার করি নি। পুজোর ছুটিতে অফিস তখন বন্ধ ছিল। বাড়িতে ছিলুম। ওর মামী ছেলেদের কাছে পাকিস্তানে বেড়াতে গিয়েছিল। আমি একা। শুধু নবাই নামে একজন বাবুর্চি ছিল—আর কেউ নেই।···

—তারপর ?

—ওকে দেখেই সন্দেহ হয়েছিল, নিশ্চয় কোন গণ্ডগোল করে পালিয়ে এসেছে। বরাবর তাই করতো। কিন্তু হতভাগা যেন বোবা হয়ে গিয়েছিল। ওর মায়ের মরার কথা তো দূরে থাক্, বানিয়েও কিচ্ছু বলল না! শুধু বলল—কিছু না। চলে এলুম। অথচ কেমন পাগলাটে দৃষ্টি। চোখ দুটো লাল। অন্যমনস্ক। ডাকলে চমকে উঠছে। তখনও কিচ্ছু টের পাই নি। ভাবলুম সবে তো এল—পরে জেনে নেব'খন। হারামজাদা আমাকে জানবার ফুরসুৎ দিল না। দেখা করে ওপরের ঘরে চলে গেল। বরাবর তাই করতো।···মামুজী চুপ করে যান হঠাৎ।

—বলুন, মামুজী।

—হুঁ, বলি।—আবার একটু চুপ করে থাকার পর উনি বলতে শুরু করেন।—ও আসার কিছুক্ষণ পরেই বকুলতলা থেকে লোক হাজির। আমার বোন ধনুষ্টংকার রোগে মারা গেছে! তখন বোঝ অবস্থা! নানান সন্দেহে ওপরে গিয়ে ওকে জেরা করলুম। কোন জবাব দিল না। ওর মায়ের খবর শুনেও ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। আমি ওকে বললুম আয়। মায়ের কবরে মাটি দিবি। ও গোঁ ধরে পড়ে রইল। রাগ করে একা বকুলতলা চলে এলুম—নবাইকে বলে এলুম—ওকে দেখিস। একটা ভুল করে ফেলেছিলুম হয়তো—চৌধুরী বা বকুল কাউকেও বলি নি মুকুল আমার ওখানে আছে। ভেবেছিলুম, কদিন যাক্, সঙ্গে করে মুকুলকে নিয়ে আসব। কেন বলি নি কে জানে

—তারপর কি হল, বলুন।

—পরদিন ফিরে গেলুম। গিয়ে দেখি, মুকুল নেই। নবাই বলল—আসছি বলে গতকাল দুপুরে বেরিয়ে গেছে। আর ফেরে নি। বিকেলে স্টেশনে বেড়াতে যাওয়ার অভ্যেস ছিল। মণ ভাল নেই। এমন একটা সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড। মুকুলই বা গেল কোথায়? প্লাটফর্মের একটা বেঞ্চে বসে আছি। ছোট্ট স্টেশন। লোকজন নেই—খাঁ খাঁ করছে! স্টেশন-মাস্টার বিজয়বাবু আমাকে দেখে এগিয়ে এলেন। দু-জনে বসে নানান কথা বলছি। কথায় কথায় বিজয়বাবু বললেন, কাল একটা সাঙ্ঘাতিক এ্যাকসিডেণ্ট হয়েছে। এ্যাকসিডেণ্ট বলা ভুল। সুইসাইড বলেই মনে হয়। ওখানটায় ওই যে দেখছেন—এখনও রক্ত লেগে আছে। বছর পনের-ষোল কিংবা আরও কম বয়েস হবে ছেলেটির—পরনে একটি নীল শার্ট ঘিয়ে রঙের ফুলপ্যাণ্ট—ভারি সুন্দর চেহারা।

—মুকুল!

—শুনেই বললুম, ডেড বডি কি এখনও আছে? বিজয়বাবু বললেন চণ্ডীপুর জংশনের মর্গে যায় সচরাচর। এতক্ষণ কি আছে? কেন?···ওঁকে কিছু খুলে বললুম না। যা ঘটবার ঘটে গেছে।

—চণ্ডীপুর জংশনে গেলেন?

হ্যাঁ!

—ডেড বডি দেখলেন?

এ্যাঁ? নাঃ! চব্বিশ ঘণ্টা অপেক্ষা করে হাফিজ করে দিয়েছে শালারা!

—তাহলে?

—বললে স্টেশনে যান। মিসিং লিস্টে পেয়ে যাবেন! ছবি টাঙিয়ে দিয়েছে।

—গিয়ে দেখলেন?

—দেখলুম।

—চিনতে পারলেন?

—মুখটায় কোন চোট লাগে নি।

—ফিরে এসে কি করলেন?

—কিচ্ছু করলুম না।

মামুজী চুপ করে গেলেন। আমিও! এ সব সময় টের পাওয়া যায়, প্রশ্ন করলেও জবাব আসবে না। অন্ধকার ঘন হচ্ছে ক্রমশ। শীতটা বেড়ে যাচ্ছে। শুকনো ঘাস শিশিরে ভিজতে শুরু করেছে।

কিছুক্ষন পরে মামুজী একটু কেসে গলাটা ঝেড়ে নেন। তারপর বলেন—ভুল না ঠিক, জানি না। তবে যখনই—যতবারই বলতে এসেছি, ওদের বাপ বেটির মুখের দিকে তাকিয়ে থেমে গেছি। বলতে পারি নি। আজ আটটা বছর সব চাপা দিয়ে রেখেছি। আর কেউ জানে না। শুধু মুকুলের মামীকে বলে ফেলেছিলুম একবার কিন্তু সেও আমাকে সায় দিয়েছিল। মড়ার ওপর আর খাঁড়ার ঘা কেন? থাক্। কত কিছু না জেনেও তো সংসারটা দিব্যি চলছে। অনেক ব্যাপার আছে, তা জানলে ক্ষতি—না জানলে নিশ্চিন্ত। কোরানে আছে—বাইবেলেও আছে, আদম গন্ধক গাছের ফল খেয়ে বিপদে পড়েছিল। তাই না?

—জানি গল্পটা।

—ফল খেয়েই আদম টের পেল, সে ন্যাংটা হয়ে আছে বেহেশত চোখের সামনে থেকে সরে গেল। দুনিয়ার শক্ত মাটিতে আছাড় খেতে হল। তার চেয়ে চোখ কান ঢেকে থাকাই ভাল রে বাবা। কি বলিস?

—কি…

—চুপ্। খবর্দার, যা বললুম, কাউকে বললে জবাই করে ফেলব।

—আমি কি করব ?

—কী করবি ?—মামুজী ধমক দেন।—বেশ তো আছিস। কোন অসুবিধে হচ্ছে ? আমি কি করব ?...আমার কথাটা ভেংচি কেটে বলেন উনি।—আসার আগে আমাকে জিগ্যেস করে এসেছিলি ? নিজের ইচ্ছেয় ফাঁদে পা দিয়েছিস—এখন ভোগ্ যা কপালে আছে।

—আমাকে এতটা বিশ্বাস করছেন কোন সাহসে ?

—তুই তো একটা হিঁচকে ফেরেববাজ। তোর দ্বারা কট্টুকুন কী হয়, জানা আছে।

—আমার সব কথা এখনও শোনেন নি, মামুজী।

—শুনব কি রে ? সারা গায়ে-মাথায় মারের চোট্। মার খেতে খেতে তোর কাল কাটল। থাম, আর বড়াই করিস নে।... মামুজী আমার একটা হাত ধরে জোর পরখ করেন! আমি আঃ করে উঠলে খিক খিক করে হাসেন। তারপর বলেন—তুই যদি খাঁটি বদমাস হতিস, এই চব্বিশ ঘণ্টায় অনেক কিছু ঘটত। টাকা পয়সা চুরি করতিস, তা নয়। চৌধুরীর আর অত পয়সা নেই! তোকে আমি ধরে ফেলেছি—তোর বদমাইসির দৌড়টা কতদূর তাও জেনেছি।

কেমন করে বলুন তো মামুজী ?

—বকুল...বকুল। বুঝতে পারছিস তো ?

না!

—বকুলকে তুই বোনের চোখে দেখেছিস। ওরা মেয়ে, পুরুষের চোখে হাবভাবে কি আছে, খোদা ওদের তা ধরবার শক্তি দিয়েছেন। তুই আমার ভাগ্নীর পাশের ঘরে রাত কাটিয়েছিস—মাঝের দরজাটা কোন কথা নয়। এবার বুঝলি হাঁদারাম ? প্র্যাকটিক্যাল ব্যাপার!

উনি হো হো করে হাসেন। বড় অবাক লাগে। এমন মানুষ

আমি কোথাও দেখি নি। তারপর হাসি থামিয়ে উনি বলেন—শীত যে বেড়ে গেল রে। ঝটপট তোর হিস্ট্রিটা বলে ফেল। সংক্ষেপে। লম্বা করলে শুনব না—মাইণ্ড ছাট।

অন্ধকারেই কৌটো বের করে আবার খৈনি সাজতে থাকেন মামুজী! আমি ভাবতে ব্যস্ত হই—কোনখান থেকে শুরু করব। গঙ্গার জল চাপা শব্দ করে নীচে। আকাশে জলহাঁসের ঝাঁক উড়ে যায়। কিছু নক্ষত্র আড়াল করে যায় তারা। গত সন্ধ্যার মতো পেঁচা ডাকে: তারপর শেয়ালের ডাক শোনা যায়। উনি বলেন—নে, স্টার্ট কর।…

আমরা দু-জনে যখন ফিরে যাচ্ছি, তখন ঘন কুয়াসা জমেছে! মামুজীর টর্চটা জ্বলে উঠছে। গাঁয়ের পথে শীত শিশির কুয়াশা অন্ধকার পেরিয়ে কোথায় পৌঁছতে চাইছি জানি না।…

—তুই যদি মুসলমান হতিস, আর একটুও প্রব্লেম থাকত না। আমার ভয় কেবল এখানেই। একটা কথা কী জানিস বাবা? সংস্কার। ছেলেবেলার সংস্কার। মানুষের জীবনের বাকী সবটাই তার ছেলেবেলা নামে একটা জায়গা থেকে কণ্ট্রোল করা হয়। কণ্ট্রোলিং সেণ্টার ওটা। আমি তোকে মুকুলের সঙ্গে মিলিয়ে দিতে গিয়ে এই কথাটা ভেবেই থমকে দাঁড়াচ্ছি। কোথায় যেন সায় পাচ্ছি নে। শুধু মনে হচ্ছে, খোদার ওপর খোদকারি করতে গিয়ে তোর কিংবা ওদের জীবনের ক্ষতি করে বসব না তো? আর তার চেয়েও বড় কথা বিবেকের কথা। দুটি মানুষকে কতদিন ঠকানো সম্ভব? সারা জীবন ওরা ঠকে থাকবে। আমিও একদিন গোরে শুতে যাবো। অথচ আমিও একজন ঠক সেজে থাকব। বিবেকের প্রশ্ন। ওদিকে তোরও একই প্রব্লেম। তোরও তো নিজের একটা আলাদা সত্বা আছে। তাকে নিয়ে তুই মুশকিলে পড়বি। স্টেজে কতক্ষণ থাকতে পারে মানুষ? সাজ খুলতেই হয়।

—তার চেয়ে আমি চলে যাই, মামুজী।

মামুজী আমার একটা হাত নিয়ে বলেন—সবুর। আমাকে সময় দে রে বাবা।···

স / দশ

এ ঘরের খাটটা বিশাল। মামুজী আর আমি এই খাটে পাশাপাশি শুতে চেয়েছিলুম—অন্তত মুকুল ঠিক তাই করতো। কিন্তু বকুল আজ নীচে শুতে গেল। মামুজীর বিছানা সে পাশের ঘরটায় করেছে। মামুজী যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও মেনে নিলেন ওর কথা। উঁকি মেরে দেখে এলেন পাশের ঘরের বিছানা। ওঁর মুখটা তারপর গম্ভীর দেখাচ্ছিল। চেয়ারে বসে চুপচাপ খৈনি ডলতে থাকলেন। বললুম—কি হল মামুজী ?

উনি মুখ না তুলেই জবাব দেন—কি হবে ? কিছু না।

হঠাৎ আমার মনে হল, আজ সেই দুপুরে আমার নীল ঘোড়ার ব্যাপারটার পর থেকে কোথাও যেন তাল কেটে গেছে। তারপর থেকে সারাক্ষণ মামুজীর সঙ্গে আছি এবং তাঁর অনেক রকম কথাবার্তা আমার মনকে ঘিরে দাঁড়িয়ে থেকেছে পাঁচিলের মতো। তাই ব্যাপারটা লক্ষ্য করা হয়নি। কিন্তু বকুলের নীচে শুতে যাওয়া এবং তারপর রিটায়ার্ড সাবরেজিস্টারার ভদ্রলোকের মুখ অস্বাভাবিক গম্ভীর হয়ে ওঠে—দুটো ব্যাপার সেই তাল কেটে যাওয়ার দিকে আঙুল নির্দেশ করল।

দুপুর থেকেই বকুলের মুখে একটা কুয়াসার দূরত্ব দেখেছি কিনা ভাবতে বসি। যত ভাবি চমকে উঠি। দুপুরে সে আমাদের সঙ্গে খায়নি। মামুজী ডেকেছিলেন—আয় মা, আগের মতো দু-পাশে দু-জনকে নিয়ে খাই। সে আসে নি। এবং রাতেও ঠিক তাই করল। খেতে বসল না। পরিবেশন করল। কিন্তু কথা বলছিল কম।

সেই দুপুর থেকে এখন শুয়ে পড়ার সময় অবধি বকুল কবার আমার সামনে এসেছে? গুনতে গিয়ে ফের চমকে উঠি। তিন-চারবারের বেশি-নয়। সেও দরকারে আমার সঙ্গে···

আরে তাই তো! আমার সঙ্গেও তো সে একবারও কথা বলে নি। আর আমি···

হ্যাঁ, আমিও ওকে যেন এড়িয়ে থেকেছি। আমিও তো কথা বলি নি। ওকে যেন ভুলেই থেকেছি···

কিন্তু সে কি মামুজীর জন্যে? মামুজী এসেই কি পাঁচিল তুলে দিয়েছেন?···

হয়তো তাই, কিংবা হয়তো তাও নয়। মামুজীর চোখে ধরা পড়ে যাওয়ার জন্যে সতর্কতায়—কিংবা এবং অপরাধবোধে ওর সংস্রব এড়িয়ে থাকতে চেয়েছি হয়তো। এমনও হতে পারে, মামুজীর সামনে খান্দানি মুসলিম পরিবারের পর্দানশীন মেয়েকে আর সহজ-ভাবে কথা বলার সাহস পাচ্ছিলুম না, যেহেতু আমি জাল মুকুল, বেজাত এবং পরপুরুষ!···

মানুষের অবচেতন মন ঠিক কাজ করে যায়। এতক্ষণে সচেতন মনে সেইসব কাজ ফুলে-ফেঁপে অতিকায় হয়ে এক ঝাঁক হাঙরের মতো খেলতে এল। জল ঘোলা করে ফেলল অস্বস্তিতে অস্থির হতে থাকি।

হঠাৎ মনে পড়ে, বকুল কতবার সামনে এসেছে, মাথা একটুখানি ঢেকেই এসেছে। গায়ের ওপর শাড়িটা খুব ভালভাবে জড়ানো ছিল। দৃষ্টি ছিল সারাক্ষণ নীচু। সে মুখ তোলে নি। কথা বলেছে আস্তে—গলার স্বরটা ছিল ভাঙা। চোখ দুটো ছিল একটু লালচে।

নাকি সবটাই আমার দেখার ভুল? এমনও হতে পারে, আমি আসার পর অন্ধ বাবার পরিচর্যায় ত্রুটি ঘটছিল। মামুজী এসে পড়ায় সে বাবাকে দেখাশুনায় ব্যস্ত হয়েছে—হয়তো এতদিন তাই করেছে। হাতের কাজ ফেলে আসা মানুষের মতো বকুল আমার কাছে এসেছিল। আবার চলে গেছে।

কিন্তু এই যুক্তিতে মন সায় দিচ্ছে না। নিশ্চয় গুরুতর কিছু ঘটেছে। দুপুরে জ্ঞান হবার পর ওর যে চেহারা দেখেছি, তা তার দাদার বীভৎস ধরনের একটা অসুখের জন্যে নিছক উদ্বেগ নয়। অন্য কিছু ছিল তার চেহারায়—যা এখন মনে পড়ছে এবং আমাকে আরও অস্বস্তিতে অস্থির করছে।

মামুজী খৈনির দলাটা মুখে ফেলে আমার দিকে একবার তাকান। তখন ডাকি—মামুজী!

—উঁ?

—বকুলের কি হয়েছে বলুন তো?

—কি হবে?

—আপনি টের পাচ্ছেন না?

মামুজী অন্তত তিন মিনিট চুপ করে থাকার পর বলেন—খুব তো নেশাভাং করে বেড়িয়েছিস বলছিলি। নেশা কাটলে কী হয়, জানিস না? কারও কারও খোয়ারি ভাঙতে দেরি হয়, এই যা।

একটু হেসে বলি—হুঁ, বকুল যে ভাবেই হোক, সব টের পেয়ে গেছে।

—তুই একটা বুড়বাক। কেন আগে বলিস নি যে তোর প্যান্টের হিপপকেটে···কথা কেড়ে প্রায় চেঁচিয়ে উঠি—আমার মানিব্যাগ ছিল!

—বুদ্ধু কাঁহেকা! তোর বাবা-মায়ের ছবি ছিল।

—ছবির তলায় লেখা ছিল 'আমার বাবা, আমার মা'।

—তার নীচে তোর দস্তখত ছিল।

—'রুনু'। আমার ডাকনাম।

মামুজী পকেট থেকে আমার মানিব্যাগটা বের করে ছুঁড়ে দেন। লুফে নিই। উনি বলেন—প্যান্ট কাচতে গিয়ে বকুল পেয়েছিল। একটু আগে যাওয়ার পর তুই বোধহয় সিগারেট খেতে বাইরে বেরোলি, তখন ও আমাকে এটা দেখাল। কান্না থামাতে সে এক

ঝামেলা। কিছুতেই বোঝাতে পারলুম না। চৌধুরীসাহেব বললেন—কী হয়েছে বকুল? আমি ব্যাপারটা চেপে দিয়ে বকুলকে ওপরে নিয়ে এলুম। বললুম, ছবিটা হয়তো ওর কোন বন্ধুর। বকুল মানল না।

—তাহলে আপনার সার্টিফিকেট কাজে লাগছে না আর।

—হুঁ। বকুল উল্টে আমাকে বাহাত্তুরে ধরেছে বলল। হা খোদা! মানিব্যাগটা খুলে ছবিটা একবার দেখে নিয়ে বলি—এটার কথা মনে ছিল না। একটুও মনে ছিল না।

মামুজী আস্তে বলেন—চৌধুরীসায়েবকে বলতে নিষেধ করেছি। মেয়েটা সেন্টিমেণ্টাল ফুল! এতক্ষণে বলে ফেলল নাকি জানি না? বেচারা জোর শক খাবেন। খোদা হাফিজ।

আমি হাসবার চেষ্টা করে বলি—তাহলে আর কি! খেল খতম পয়সা হজম।

মামুজী বুকপকেট থেকে একটা ভাঁজকরা কাগজ বের করেন। খুলে একবার চোখ বুলিয়ে নেন। তারপর বলেন—সত্যি আমাকে বাহাত্তুরে ধরেছে। তুই চিঠিটা পড়ে ছাখ্। চৌধুরী সাহেবের হাতের লেখা নয়—বকুলের। উনি বলেছেন, ও লিখেছে।

চিঠিটা নিয়ে পড়তে থাকি।···

'ভাই আলি'

পত্রপাঠ আমাদের বাড়ী চলিয়া আসিবে। মুকুল ফিরিয়া আসিয়াছে। আমার শরীর ও মনের গতিক ভাল নহে। বিষন চিন্তায় পড়িয়াছি। তুমি না আসিলে কোন মিমাংসা হইবে না। অধিক সাক্ষাতে বলিব। তুমি পত্রবাহকের সঙ্গেই আসিবে। সবই খোদার মরজি। ইতি···'

চিঠিটা আমার হাতে কাঁপে। নাকি হাতটাই কাঁপে। ফিরিয়ে দিয়ে বলি—হুঁ, চৌধুরীসায়েবের মনে কোথাও একটা সংশয় থেকে গিয়েছিল। সে তো স্বাভাবিক! অথচ আমি ভেবেছিলাম উনি

মেনে নিয়েছেন! আমারই বোকামি! মামুজী, আশ্চর্য লাগছে ভাবতে। চৌধুরীসায়েব আমাকে একটুও বুঝতে দেন নি। কিন্তু গতকাল সন্ধ্যায় আমাকে ওঁর স্ত্রীর কবরে নিয়ে গেলেন কেন তাহলে?

মামুজী একটু ভেবে নিয়ে বলেন—হয়তো তোকে পরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন!

—তাহলে নির্ঘাৎ পরীক্ষায় ফেল করেছিলুম।

—করেছিলি। চৌধুরীসায়েব শুধু আমার মুখের কথায় তোকে মেনে নিয়েছেন। আমি বলেছি, মুকুলের গায়ে-মাথায় অনেক ঘায়ের দাগ আছে। ডানপিটেমি করতে গিয়ে কোথাও প্রচণ্ড মারধোর খেয়ে ছিল। তাই মগজ ঘুলিয়ে গেছে। তাছাড়া, হিন্দুদের সংসর্গে হিন্দু সেজে বাস করেছে।—মামুজী হঠাৎ থেমে অভ্যাস মতো জিভে চুক চুক শব্দ করেন। ফের বলেন—এখন দেখছি, গোলটা আমি এসেই বাধালুম! কী ভাবলুম, কী হয়ে যাচ্ছে!

—এসে সব ফাঁস করে দিলেই পারতেন!…বলে আমি ক্ষুব্ধভাবে উঠে দাঁড়াই।

মামুজী বলেন—বস্‌। কথা শোন্‌। আমি এত অসহায় রে!

—আপনি ইচ্ছে করেই গোলমাল পাকিয়েছেন!

—হুঁ। কেন জানিস? প্রথম কথা—বকুলের সরল বিশ্বাস দেখে। একমাত্র তার মনেই কোন কুটো ছিল না। হারানো ভাইয়ের জন্যে তার জীবন াকা হয়ে গিয়েছিল। মা যে তার ভাইয়ের ঢিলেই মারা পড়েছে, এটাই ছিল তার একটা সিরিয়াস পয়েন্ট। এর কৈফিয়ত চাইতে দিন গুণে বসে ছিল হতভাগিনী! যখন সামনে মুকুলের মতো কাকেও দেখল…

বাধা দিয়ে বলি—জানি। আমাকে প্রথমেই সে তার মায়ের রক্ত দেখাল। আমি আন্দাজে ঢিল ছোড়ার মতো রক্ত চিনলুম!

—ব্যস, বকুলের আর কোন দ্বিধা রইল না!···মামুজী মাথাটা ঢুলিয়ে আফসোস প্রকাশ করে আবার বলেন—এবার আমার সেকেণ্ড উইকনেসটা কোথায় হল শোন। তোকে দেখে।

—আমাকে?

—হ্যাঁ, তোকে দেখে। হা খোদা! এ এক তাজ্জব ব্যাপার! মুকুলের সঙ্গে তোর এত মিল.! শুধু চেহারায় নয়, আচার-আচরণে, কথা বলার ভঙ্গীতে। কোন কথার যা জবাব মুকুলের পক্ষে দেওয়া সম্ভব ছিল, তুই ঠিকঠাক তাই দিচ্ছিস! আমি তোকে আগ্রাহ্য করবার জোর পাচ্ছিলুম না—বুঝলি বাবা? বার বার মন হচ্ছিল—জংশনের দেওয়ালে টাঙানো ছবিতে ভুল দেখি নি তো?···মামুজী রুমাল বের করে চোখ মুছে ফের বলেন—মায়া পড়ে গেল। এ বড় কঠিন মায়া, বাবা। ছেলেপুলে ভাগ্নে-ভাগ্নী যার আছে, যার বরাতে এমনটি ঘটেছে—সেই জানবে এ মায়া কেমন মায়া!

খাটের তলা থেকে কিটব্যাগটা টেনে বের করলুম—আমি যাই, মামুজী।

—কোথায় যাবি? বাইরে শীতের রাত্তির কুঁকড়ে মারা পড়বি শ্যাল কুকুরের মতো। চুপ করে শো।

আমি কান পাতি না।—আমার প্যাণ্টটা কোথায়? বলে দরজার কাছে গিয়ে চেঁচিয়ে ডাকি—বকুল! বকুল! আমার প্যাণ্ট কোথায়? অন্ধকার শীত কুয়াসা স্তব্ধতা আর এই পুরনো বাড়িট জুড়ে আলোড়ন ঘটে যায়।

মামুজী আমার কাঁধে হাত রেখে গর্জে ওঠেন—চুপ! ষাঁড়ের মতো চেঁচাস নে।

আমি গ্রাহ্য করি না ডাকতে থাকি—বকুল! বকুল!

মামুজী আমার মুখে হাত চাপা দিয়ে টেনে আনেন। ধাক্কা খেয়ে বিছানায় পড়ি! তারপর উঠে বসি। আমার শরীরে একটুকু

শক্তি নেই কেন বুঝতে পারি নে। মাথাটা খালি লাগে। শ্বাসকষ্ট হয়।

সামনে দাঁড়িয়ে রিটায়ার্ড সাবরেজিস্টারার চাপা গলায় শাসান—তালাবন্দী করে রেখে দেব। খবর্দার!

—কেন আমাকে বাধা দিচ্ছেন আপনি!

—তোকে পুলিসের হাতে দেব। বুঝতে পারছিস! ভুত কাঁহেকা!

—হ্যাঁ তাই দিন।...হাঁফাতে হাঁফাতে বলি।—পুলিস আসতে দেরি করছে বলেই তো ছল করে আটকে রেখেছেন সেই দুপুর থেকে। সব বুঝতে পারছি এতক্ষণে।

মামুজী আরও ক্ষেপে গিয়ে বলেন, হ্যাঁ। আমিনগঞ্জ থানা থেকে এক মাইল আসতে পুলিসের বড্ড দেরি হচ্ছে। তাই তোকে আটকে রেখেছি হতভাগা! সেজন্যেই মইনুল কাজীকে বিকেলে শাসিয়ে বলেছি—খবর্দার! আমার ভাগ্নের ব্যাপারে নাক গলালে বিপদে পড়বে! ইডিয়েট! বুদ্ধু! ভুত!

ওঠবার চেষ্টা করতেই টের পাই ওঁর গায়ের জোরে পারব না। আমার এ শরীর যে একেবারে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে, মাঝে মাঝে কতবার তা এমনি অবস্থায় টের পেয়েছি। হায়! আর সেই রিভলবারটা নেই। আত্মরক্ষার একমাত্র অবলম্বনটা জলে ছুড়ে ফেলে এখন বুঝতে পারছি, আমি একটা পিঁপড়ের চেয়েও অসহায়। আমার চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসে। তারপর হঠাৎ কেরোসিন বাতির ম্লান আলোয় ঘরের ভেতরটা প্রসারিত হয়ে যেতে দেখি। মনে হয় দেয়ালগুলো হু-হু করে দূরে সরে যাচ্ছে। ভাসা-ভাসা অস্পষ্ট আসবাবপত্র ঠেলে কুয়াসার মতো একটা নীলাভ কিছু এগিয়ে আসার চেষ্টা করছে। দেখতে দেখতে সে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সেই নীল ঘোড়াটা মুখ তুলে এগিয়ে আসছে। স্ফীত নাসারন্ধ্রে কুয়াসা বেরুচ্ছে। বড় বড় দুটি কাজল টানা চোখ—প্রচণ্ড লাল সেই চোখ।

তার খুরের খটাখট শব্দ শুনতে পাচ্ছি। তারপর সে শূন্যে দু-পা তুলে হ্রেষাধ্বনি করে। ঝড়ের মতো বেজে ওঠে অর্কেস্টা। টু নাইট হানড্রেড মাইলস্। ও টুনাইট হানড্রেড মাইলস্ ফর ইউ!

আমি লাফ দিয়ে তার পিঠে ওঠার চেষ্টা করি এবং প্রচণ্ড জোরে চেঁচিয়ে বলি—শোভানাল্লা! শোভানাল্লা! বিশাখা—আ—আ—আ!

প্রচণ্ড শীত। চোখ খুলি। কিছু দেখি না কোথাও। কারা চাপা গলায় কথা বলে। চোখের সামনে হলুদ পাঁচিল দেখতে দেখতে পাঁচিলটা দূরে সরে যায়। বলি—আঃ শীত করছে। কে যেন বলে—ও ঘর থেকে আরেকটা লেপ নিয়ে এস তো মা।

দেখি, অন্ধ বুড়ো মানুষটি পায়ের দিকের চেয়ারটায় বসে আছেন। বকুলকে দেখি পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকতে। মুখ ঘুরিয়ে প্রথমেই চোখে পড়ে এক জোড়া মস্তো গোঁফ। একটু হাসি।—মামুজী!

কোন জবাব পাই না। তখন বলি—আপনারা আমায় ক্ষমা করুন। সত্যি, আমি দুঃখিত।

মামুজী বলেন—জল খাবি!

—খাব।

পাশের টেবিল থেকে জলের গ্লাস নিয়ে সামনে ধরেন। উঠতে গিয়ে টের পাই, পারছি না। তখন হাঁ করি। মামুজী সাবধানে জল গড়িয়ে দেন কয়েকবার। বলেন—আর খাবি?

—না। ধন্যবাদ মামুজী!

—ঘোড়া পালিয়েছে! খিক খিক করে একটু হাসেন উনি। ফের বলেন—যত সব! লোকে দেখে ভুত পেত রাক্ষস খোক্কস। আর উনি দেখেন ঘোড়া!

ওঁর হাসিটা স্বতস্ফূর্ত নয়, তা বুঝতে পারি। শুকনো—বিষণ্ণ। এইসময় বকুল লেপ এনে দেয়। আমার দিকে একবারও তাকায় না।

না। মামুজী লেপটা আমার গায়ে চাপিয়ে দিয়ে বলেন—আর লাগবে ?

—না, মামুজী।...বলে বকুলের দিকে তাকাই।—বকুল। তোমার ঘুম পণ্ড করায় দুঃখিত, বোন। এবার যাও, ঘুমোও। সকাল হলেই চলে যাব—আর তোমাদের জ্বালাব না।

অন্ধ বৃদ্ধ পাথরের মূর্তির মতো বসে আছেন। বকুল তাঁর পাশে গিয়ে মৃদু স্বরে বলেন—চলুন, আব্বা।

ওঁর ঠোঁট দুটো কাঁপে। হয়তো বলার ইচ্ছা। গলা ঝেড়ে নেন। তারপর আবার ঠোঁট কাঁপে। মামুজী বলেন—চৌধুরীসায়েব। শুয়ে পড়ো গিয়ে। রাত একটা হয়ে গেছে।

অন্ধ ডাকেন—আলি ভাই!

—বলো চৌধুরীসাযেব!

—কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে পড়েছে ভাই। আর কী বলব ? যাই হোক, তোমাকে ডেকেছিলুম—ডেকে ভালই করেছিলুম। যা করবার এখন তুমিই করো। খোদা হাফিজ!

—খোদা হাফিজ!

বকুল তার অন্ধ বাবার হাত ধরে। উনি উঠে দাঁড়ান। আস্তে আস্তে দু-জনে বেরিয়ে যায়। কতক্ষণ স্তব্ধতার পর মামুজী আমার মাথায় হাত রেখে বলেন—কী রে! তোর কপাল তো বরফের মতো ঠাণ্ডা! তবে যে শীত করছে বলছিস!

উনি লেপের ভিতর দিয়ে আমার বুকের চামড়া পরখ করেন। ফের বলেন—নাঃ! জ্বর-টর নয়। ঘামছিস মনে হচ্ছে যে রে! তোর সবই দেখছি উল্টোপাল্টা।

—মামুজী! আপনি এই খাটে শোন্ না। আমার ভয় করছে!

—গাল টিপলে দুধ বেরোচ্ছে! কথা শোন।

—প্লীজ. মামুজী। সত্যি আমায় ভয় করছে।

—হ্যাঁ, শুই আর তোর ঘোড়াটা এসে আমার পেছনের পায়ে লাথি ঝাড়ুক। আমি খাট থেকে পড়ে অক্কা পাই। ভালো বলেছিস!

—প্লীজ, মামুজী! আমার সত্যি বড় ভয় করে।

মামুজী রেগে যান।—ছ্যাখ, খবর্দার বলছি, মুকুলের গলায় কথা বলবি নে। খুন চড়ে যাবে মাথায় তখন জবাই করে ফেলব। নিজের গলা নেই হতভাগা? পরেরটা ধার করেছিস!

আমি ক্ষুব্ধভাবে মুখ ঢাকি লেপে। তারপর নড়াচড়ার শব্দ হয়। তারপর কিছুক্ষণ স্তব্ধতা। তারপর আবার কী সব শব্দ। নীচে কোথায় দেয়ালঘড়িতে একবার ঘণ্টা বাজে।—কই, সরে শো!

মুখ বের করে দেখি, মামুজী খাটে উঠেছেন।—মামুজী! আপনি এত ভাল! আপনি আমার সত্যিকার আঙ্কল্, মামুজী! মাই বিলাভেড মামুজী—ও মাই সুইট-সুইট আঙ্কল!

—ন্যাকামি রাখ। হ্যাঁ রে, মুকুলের মতো বিছানায় হিসি করার অভ্যেস নেই তো? ছেলেটা ধেড়েবয়সেও ওই কাণ্ড করতো হোমিওপ্যাথি ওষুধ খাওয়াতুম। শিশিসুদ্ধ খেয়ে ফেলতো। বড্ড বেয়াড়া ছেলে ছিল!

—আপনি হোমিওপ্যাথি করতেন? মাই গুডনেস!

—ভাগ্! ওইগুলিতে আমার ফেইথ নেই। আমার বেগম-সায়েবার ছিল।

—মামীর? ও মাই সুইট আন্টি! হোয়ার আর ইউ?

—ছোঁড়াটা তো নির্ঘাৎ পাগলা। নাকি ভাবছিস পাগল সেজে ভোল বদলাবি? সকাল হতে দে।...একটু পরে বলেন, আর বকবক করিস নে। খুব জ্বালাচ্ছিস এসে থেকে। হাত বাড়িয়ে বাতিটা নিবিয়ে দে। ঘুমো। ঘুমের তুল্য মেডিসিন নেই সংসারে। সাউণ্ড স্লিপ হলেই পাগলামি সেরে যায়।

বাতি নিবিয়ে দিই। অন্ধকার হয়ে ওঠে ঘর। খুব শীগগি

মামুজীর নাক ডাকা শুরু হয়। আমি অন্ধকারে তাকিয়ে থাকি। নীল ঘোড়াটাকে খুঁজি। দু-একবার আবছা ভেসে ওঠে তার মূর্তি—কিন্তু তখনই টের পাই, এ দেখা সত্যিকার দেখা নয়—আমার ইচ্ছাকৃত কল্পনা। অন্ধকারে হলুদ শস্যক্ষেত্র নির্জন হয়ে পড়ে থাকে। কোথাও আর কিছু নেই।

নীচে দেয়ালঘড়িতে চারবার ঘণ্টা বাজে। রিটায়ার্ড সাবরেজিস্টার লেপ মুড়ি দিয়ে চিত হয়ে শুয়ে আছেন! নাক ডাকার শব্দে তা বুঝতে পারি। সাবধানে উঠি। সুপ্রাচীন ভারি খাট পাহাড়ের মতো শব্দহীন। আর, এ রকম সন্তর্পণ নড়াচড়া এবং পা ফেলায় আমি কতকাল থেকে অভ্যস্ত। ঘরের অন্ধকার আর অন্ধকার নয়।

কিন্তু প্যাণ্টটা এখন মাথা খুঁড়লেও পাব না। বকুল ওটা কী করেছে, জানি না। আমার ছোট মানিব্যাগটা পাওয়ার পর সে নিশ্চয় প্যাণ্টটা কাচতে বসে নি! ফেলে দিয়ে থাকবে—রাগে দুঃখে ঘৃণায়। কোথায় ফেলেছে খুঁজে বের করা কঠিন। অতএব এই পাজামা পরেই বেরোতে হবে। সোয়েটারটা মাথার কাছে ছিল মনে পড়ছে। শার্টটা কোথায় আছে জানি না। আমার গায়ে অন্ধ বৃদ্ধের পাঞ্জাবি। সোয়েটারটা তার ওপর পরে নিই। খাটের ধারে বসে পড়ি। সাবধানে কিটব্যাগ ছুঁই এবং টেনে বের করি।

পুরনো বাড়ির ভারি কাঠের দরজা শব্দহীন খোলে। মনে হয়, আমার চলে যাওয়াতে বাড়িটা একটুও আপত্তি করতে রাজী নয়। কিন্তু তার দেয়ালে-দেয়ালে হাজারটা চোখ অন্ধকারে নিষ্পলক তাকিয়ে আমার গতিবিধি দেখতে থাকে। শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ করে বাড়িটা উৎকণ্ঠায় ভোগে। মনে মনে বলি, আমাকে ভয় করো না। আমার মধ্যে আর ভয়ের কিছু নেই।

সিঁড়িতে পা ফেলি। এক হাতে দেয়াল ছুঁয়ে নামতে থাকি।

বারান্দা। বারান্দায় বাঁ-দিকে ঘুরি। একটা প্যাসেজ। তার শেষ প্রান্তে সদর দরজা। কোথাও আলো নেই।

বাইরে অপেক্ষা করে আছে রাতের শেষ প্রহরের হিমতম কুয়াশা প্রগাঢ় শিশির—রক্তের মতো ঘন আর থকথকে। ডাইনে জানলার ফাটলে আলোর রেখা দেখে থমকে দাঁড়াই। ওই জানলার কপাট দুটো ভালভাবে বন্ধ করা যায় না বলেই আলো আসে। চোখ রেখে দেখি, অন্ধ বৃদ্ধ ওদিকে ঘুরে বিছানায় বসে আছেন—পা দুটো পিছনের দিকে ভাঁজ করা। দু-হাত দুই হাঁটুর ওপর। প্রার্থনা করছেন। মিটমিট আলোয় ওঁর টুপি ও সাদা পোশাক পরা মূর্তি থেকে জ্যোতি ঠিকরে বেরোচ্ছে যেন। আমায় ক্ষমা করুন।

তারপর চোখ পড়ে অন্য পাশের একটা বিছানা। ছোট তক্তপোশে লেপ ঢাকা একটা মানুষ—নিশ্চয় বকুল। মাঝের টেবিল একটা ঘন ছায়া ফেলেছে বলে স্পষ্ট দেখা যায় না। বকুল! লক্ষ্মী বোন আমার, ক্ষমা করিস।

সদর দরজা খুলতে গিয়ে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করি—আবার আসব এ বাড়িতে। কোন একদিন আসবই। সেদিন অন্য কারও পরিচয়ে নয়—নিজের যথার্থ নামধাম নিয়ে।

দরজাটা সাবধানে বাইরে থেকে ঠেলে দিয়ে উঁচু বারান্দায় যাই। অমনি প্রচণ্ড শীত এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কোথাও হাসি শুনছি কি? বড় ঠাণ্ডা আর গভীরতর সেই চাপা হাসি। মুকুল হাসছে। আমাকে হারিয়ে দিয়েছে খেলায়।

রাস্তায় পৌঁছে কিছুক্ষণ মনে হতে থাকে, অসম্ভব এই যাত্রা। মাথার ভিতরটা খালি লাগে। পা টলে। অসহায় মনে হয় নিজেকে। নীল ঘোড়া! আমার নীলঘোড়া! কোথায় তুমি?

কোন সাড়া আসে না। আকাশের নক্ষত্র ঢেকে ফেলে কুয়াশার ঝাঁক। নীলঘোড়া! তুমি কি আমাকে ছেড়ে গেলে?

কী যে স্তব্ধতা! কোথাও আর সেই খুরের শব্দ শুনি না।

হলুদ শস্যের ক্ষেত নিরাপদে পড়ে আছে চার দিকে। কোথাও নেই হ্রেষাধ্বনি—ঝড়ের মতো অর্কেস্টায় বেজে ওঠে না একশো মাইল চলার গান! প্রতিশ্রুত মেয়ে বিশাখার কথা অলীক হয়ে যায় কুয়াশাময় শূন্যতায়। আর কোথাও কেউ নেই—কোথাও যাবার তাগিদ নেই। অথচ বেরিয়ে এলুম। দুঃখে ক্ষোভে অস্থির হই। টলতে টলতে পা বাড়াই। নীলঘোড়া! আর কি তুমি আসবে না?

কুয়াশার ঝাঁক মেঘের মতো আসে এবং চলে যায়। দূরে জ্বলজ্বল করে কিছু আলো। ওটাই তাহলে নন্দীগ্রাম স্টেশন। আলো দেখে একটু করে শক্তি ফিরে আসে। আলোর দিকে পৌঁছতে জীবনটাকে লড়িয়ে দিই।

স্টেশনের বাইরে নীচের চত্বরে দু-তিনটে দোকান সবে খুলেছে। উনুনে ধোঁয়া উঠছে। ঘুম-ঘুমে চোখে আলুর বস্তার মতো কিছু মূর্তি নড়াচড়া করছে। কাছে গেলে তাদের একজন আমার দিকে জুলজুলে চোখে তাকায়।

—চা হবে?

—বসুন।

বুঝতে পারি শীত আমাদের সবাইকে অপ্রয়োজনীয় কথা বলতে দেবে না। চাওলা লোকটাও বোঝে। সে উনুনের সামনে হাতপাখা নিয়ে ঝুঁকে পড়ে। বেঞ্চে বসে অস্ফুটস্বরে বলি—শোভানাল্লা!

চাওলা একটু হেসে বলে—দাদা কি বকুলতলার মিয়াবাড়ি থেকে আসছেন?

—কেন ব্রাদার?

—আল্লাতাল্লা বললেন যে!

হাসতে গিয়ে দেখি চোয়াল নড়ছে না। অতিকস্টে বলতে চেষ্টা করি—শোভানাল্লা!

চা, আরও চা. অনেক চা। আবার গেলাস এগিয়ে দিয়ে চাওলা হাসে। মিয়াসাব! খুব চা খান দেখছি। তখন লাল স্টেশনঘরের মাথাটার দিকটায় ডিমের হলদে কুসুম মাখামাখি হচ্ছে। তেলতেলে আঠালো আলো গাছের কুয়াশাগুলো গিলে খাচ্ছে। স্টেশনের ধাপের ওপর ধুম-ঘুম চোখে নেড়ি কুত্তাটা হাই তুলল। ছুচলো রেলিঙের ওপাশে হাঘরে ভিখিরী উঠে বসল। টিউবেলে চান করতে এল কোন পাঁড়েজী। নিশ্চয় পালোয়ান কুস্তিগির লোকটা। গায়ে ধুলো লেগে আছে। পৈতেটা কোমরে জড়ানো ছিল। বসেই মাঞ্জা দিতে থাকে সে। একটি-তুটি করে রিক্‌শা আসছে। কম্বলজড়ানো রেলযাত্রী বসে আছে। রিকশাওলারা এবং যাত্রীরা ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে পাশার দানের মতো চায়ের দোকানগুলোতে ছড়িয়ে পড়ছে। এরই নাম পৃথিবী। শালা পৃথিবী!—চা দাও!

চাওলা বলে—পাঁচটা হয়েছে মিয়াসাব!

—ছটা হোক মিয়াসারের।

পকেটে হাত ঢুকিয়ে টের পাই এক অন্ধ বৃদ্ধের পোশাক পরে আছি। ভুল স্নেহ ভুল সন্তান। মানিব্যাগটায় বকুলের হাত পড়েছিল! খুব খুশি হই। চায়ের দাম দিয়ে উঠে দাঁড়াই। সামনে চত্বরের শেষে নীচু জমিতে রেলকোয়ার্টার। কোথাও মালতী আছে ভেবে চমকে উঠি। ভয়ে-ভয়ে তাকাই। চাওলাও জুলজুলে চাউনিতে আমাকে লক্ষ্য করে। আমার পায়ের স্যাণ্ডেল তুটো শিশিরে ধুলোয় ভিজে ভারি আর পা-তুটো অবশ। পাজামার নীচের দিকটাও ভেজা। ময়লা হয়ে গেছে। আস্তে আস্তে হেঁটে চত্বরের শেষে একটা বিশাল শিরীষগাছের তলায় যাই। নীচে ওপাশে একদল হাঘরে আগুন জ্বেলে গোল হয়ে বসে আছে। ওই আগুনের উত্তাপ নিতে এত লোভ হয়! ওদের মধ্যে বসে পড়ি। ওরা অবাক হয়ে যায় নিশ্চয়। একজন বলে—বাবু, সিকরেট দিন! সিগারেট দিই। এই সিগারেটও বকুলের হাতের আদর পেয়েছে! বকুল কত প্যাকেট সিগারেট

আনিয়ে দিয়েছে মনে পড়ে না। আমি তার মমতায় ভরা সিগারেট ধরাই॥ উত্তাপ নিই। কেউ আর কথা বলি না। এখন এক প্রাগৈতিহাসিক ভোরবেলায় আমরা কিছু বুনো সভ্যতাহীন মানুষ আগুনের স্তূপে টগবগে তাজা বেপরোয়া জীবনের স্বাদ পেয়ে অভিভূত। কে অজানা ভাষায় কিছু বলে। দুটি বাচ্চা দৌড়ে গিয়ে শুকনো শিরীষপাতা কুড়িয়ে আনে। কে কত বেশি আনবে, তার প্রতিযোগিতা চলে। এক যুবতী নিঃশব্দে গৌরবে হাসতে থাকে। হয়তো ওদের মা। আমি বাচ্চা দুটোকে একটা একটাকার নোট দেখাই। অমনি সব ছোটাছুটি আর আগ্রহে কয়েকমুহূর্তের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। সবগুলো মুখ আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। আমি বলি—বকশিশ! আউর আগ জ্বালাও! তাই শুনে যুবতীটি সিরিয়াস হয়ে কিছু আদেশ করে। একজন মধ্যবয়সী লোক ওঠে! তার হাঁটুর মটমট শব্দ শুনি। সে ঠোঁটে সিগারেট কামড়ে শিরীষতলায় গিয়ে বড় বড় দুই হাত ছড়িয়ে শুকনো পাতা জড়ো করে। বাচ্চা দুটো একটা চট নিয়ে যায়। অনেক পাতা। অনেক আগুন। হাত-পা বুক পিঠ আগুনের কাছে একে একে নিয়ে যাই। চাঙ্গা হয়ে উঠি। তারপর ক্রমশ বমিভাব আসে। খালি পেটে বেশি চা খাওয়ার ফলেই কি? মুখে জল উঠতে থাকে। আর সামলাতে পারি না। ঘুরে বসে হড়হড় করে বমি করে ফেলি।

কয়েকজোড়া আদিম চোখ দুঃখিত দৃষ্টিতে আমাকে দেখে। উঠে চত্বরের দিকে যাই। মাথা ঘুরে ওঠে। টিউবেলের পাঁড়েজী অসাধারণ ভব্যতায় একটু করে 'লিজিয়ে' বলে হাতল টেপে! মুখ ধুয়ে রুমালে মুছতে মুছতে ঘুরি। সেই বাচ্চাদুটোকে দেখতে পাই। আগুনের দাম নিতে এসেছে। সেই টাকাটা কোথায় রাখলুম খুঁজে পাই নে। বলি—রূপেয়া দিয়া নেহী?

দু-জনেই ভোরের পাখীর স্বরে বলে ওঠে—নেহী বাবুজী।

মানিব্যাগ খুলে যা হাতে ওঠে, তাই দিই। ওরা নিয়েই দৌড়ে

চলে যায় শিরীষতলায়। দুঃখে ভাবি, সুখ আমার সয় না। আগুনের সুখ সইল না। আবার শীতে কাঁপুনি ধরে যায়। মাথা ঘোরে। বমি ভাবটা ঘোচে না। একটা পানের দোকানে যাই। পানওয়ালা সবে চায়ের গেলাস সামনে রেখে চুল আঁচড়াচ্ছে। তার মুখের পাশে আমার মুখ। চমকে উঠি। ও কে? আমি কোথায় গেলুম রে বাবা? বাদামী সোয়েটারের ওপর খড়ি দিয়ে আঁকা কার মুণ্ডু ভেবে পাই না। পানওয়ালা সরে বসে। চায়ে চুমুক দিয়ে খুব নিষ্ঠার সঙ্গে পান সাজতে থাকে। আয়নার দিকে তাকিয়ে থাকি। নিজের চেহারা স্মরণ করি। মনে পড়ে না। তাহলে কি আমি কোন-না-কোন ভাবে অন্য কারও শরীর বয়ে বেড়াচ্ছি? মাথার চুল সরিয়ে ক্ষত চিহ্ন দেখার চেষ্টা করি। এখনও রোদ ফোটেনি। স্পষ্ট দেখতে পাই না। ভিজে অবশ আঙুলে কোন অনুভূতি নেই।
—বাবু, নিন। সাদা জর্দা দেব?

আয়নার দিকে দৃষ্টি আটকে থাকে। বারবার মনে মনে প্রশ্ন করি —আমি কোথায়? কিছু বুঝতে পারি না। ব্যস্তভাবে ক্ষত চিহ্ন হাতরাই মাথায় সবখানে। —বাবু, পান নিন।

নীল ঘোড়া! আবার এলে তুমি আমাকে চিনতে পারবে তো? নীল ঘোড়া, আমাকে কোথায় রেখে এসেছ তুমি?

—বাবু পানটা নিন।

পানওয়ালাটাকে জিগ্যেস করব কি আমার মাথায় কোন ক্ষতচিহ্ন আছে নাকি? না—এই তো আমার হাত! কনুইয়ের কাছে ছোরার দাগটা কোথায় গেল? সোয়েটার খুলে ফেলি। পানজাবির দুই হাতা পালাক্রমে গুটিয়ে নিয়ে খুঁজি। দাগগুলো কোথায় গেল? নিশ্চয় ভুল হচ্ছে কোথাও। এই অক্ষত শরীর আমার নয়। কোত্থেকে একটা ভুল শরীর জুটিয়ে ফেলেছি। পানজাবিটা এক্ষুনি খুলে ফেলি। অবাক হয়ে চেঁচিয়ে উঠি—শোভানাল্লা।

—কী হল বাবু পান...

কিম্ভুত একটা বিদঘুটে মূর্তি আয়নার ভেতর নাচানাচি করে। পানজাবিটা ছুড়ে ফেলে দিই তার দিকে। পানওয়ালা ভড়কে গিয়ে বলে—যা বাবা! সকাল বেলা পাগলের পাল্লায় পড়া গেল!

—খবর্দার! আমাকে পাগল বলবেনা। বলে হনহন করে পীচের রাস্তায় চলে যাই। কিছুটা গিয়ে থমকে দাঁড়াই। কোথায় যাচ্ছি? বকুলতলা তো এদিকেই। কিন্তু আবার সেখানে কেন?

হুঁ, নিজের শরীর ফিরিয়ে আনতে। বড্ড ভুল হয়ে গেছে দেখছি। কীভাবে হল বুঝতে পারি না। পা বাড়াই। তারপর শুনি কেউ পিছন থেকে থাকছে—বাবু! আপনার জামা। জামাটা নিয়ে যান।

ঘুরে দেখি পানওয়ালা নীচে নেমে দাঁত বের করে হাসছে। তার হাতে একটা পানজাবি। চেঁচিয়ে বলি—রেখে দাও। এক্ষনি আসছি।

তারপর দৌড়তে থাকি। দুধারে হলুদ ক্ষেতের ওপর কুয়াশার কোমর জড়িয়ে ধরে ঢ্যাঙা লম্বাটে রোদ জোর নাচ শুরু করে। দেখতে দেখতে ছুটি। চেঁচিয়ে উঠি—শোভানাল্লা। পীচের রাস্তা জুড়ে কাদা থকথক করে কেন বুঝি না। পাদুটো আটকে যায়। স্যাণ্ডেলের ফিতে পটাপট ছিড়ে যায়। পা থেকে খুলে না যাওয়া অব্দি আটকে রাখার চেষ্টা করি। তারপর দেখি শুধু ছুটছি আর ছুটছি। পিঠ থেকে কীটব্যাগটা কখন পড়ে গেছে। সোয়েটারও নেই। তবু থামি না। গায়ের গেঞ্জিটা আমাকে ধরে থাকে—বেরিয়ে ফসকে যেতে দেয় না। গেঞ্জিটা বকুল কেচে দিয়েছিল। বকুল, আমার বোন বকুল! কোথায় লুকিয়ে রাখলে আমার শরীর?

পীচের রাস্তাটা চলেছে—আমার সঙ্গে সঙ্গে চলেছে। সে কিছুতেই সঙ্গ ছাড়বেনা। তাকে চোখ রাঙিয়ে বলি - খবর্দার! বকুলতলাকে বগলদাবা করে রাস্তাটা আমার আগে আগে দৌড়ে পালিয়ে যাচ্ছে। তাকে ধরতে পারি না। শুধু দৌড়াতে থাকি। বকুলতলা যাই! আমার শরীর চাই! নীল ঘোড়া চাই। বিশাখা চাই। এখন আমার অনেক কিছু চাই। শোভানাল্লা!

সি/এগারো

পীচের রাস্তা আমাকে আর ছেড়ে দিচ্ছে না। ছুটছি হাঁটছি। আর হাঁটু তুমড়ে বসে তার দিকে চোখ কটমট করে তাকিয়ে বলছি—আমাকে ছাড়বি কিনা? তাকে ঘুষি মারছি। চড় থাপ্পর কিল। হাত ব্যাথা। কেটে রক্ত পড়ে। তখন তার ওপর উপুড় হয়ে পরি। কান্নাকাটি করি। তারপর গাল দিতে দিতে উঠি। লাঠালাঠি করি। আঠায় আটকে যাওয়া পোকার মতো এ এক বিচ্ছিরি অবস্থা। কখন হঠাৎ মনে পড়ে যায়, আরে তাই তো! আমি যে বকুলতলা যাচ্ছিলুম। বকুলতলা কত দূর? একশো মাইল? টু নাইট হানড্রেড মাইল ফর ইউ বকুলতলা—আ—আ—আ! কোমর তুলিয়ে নাচতে থাকি। হঠাৎ চোখে পরে আমার পিছনে ফকঝাঁক ছেলে পুলে খিলখিল করে হাসছে। হাততালি দিচ্ছে।

—এই শোভানাল্লা! থামলে কেন?

মাথায় খূন চড়ে যায়।—আমার খূশি! বলে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকি। সামনে থেকে বাস কিংবা ট্রাক এসে প্রচণ্ড ভ্যাঁক দেয়। নড়ি না। পীচের রাস্তা! তুই কার?

—তোমার।

—শোভানাল্লা! বলে লাফিয়ে উঠি। ছুটতে থাকি।

কখন খিদে পায়।—পীচের রাস্তা! বড খিদে পেয়েছে ভাই। খাচ্ছি—কিছু মনে করিস না। বলে পাতে বসার মতো নিষ্ঠায় বসে পড়ি। পীচের রাস্তা থেকে পাথর কুচি ধুলো পীচের টুকরো তুহাতে টেনে জড়ো করি। মুখে পুরে চিবোতে থাকি। তারপর থু থু করে ফেলে দিই। গাল দিই। —ক্ষুধার্ত মানুষকে তুই ঠকাচ্ছিস রে? ছিঃ। অভিমানে আমার চোখ ফেটে জল আসে। তারপর মনে

পড়ে যায়, পানের দোকানে সেই পানজাবিটার কথা। আমার মানিব্যাগটা। আমার মানিব্যাগ! বলে দৌড়তে থাকি। পানের দোকানটা খুঁজে পাইনে। যাকে সামনে পাই, জিগ্যেস করি। তারা পরস্পর মুখ তাকাতাকি করে। কেউ বলে—মানিব্যাগ হারিয়েছে?

তাকে কী যে ভাল লাগে। বলি—আজ্ঞে হ্যাঁ। পানওয়ালা নিয়েছে।

—কোথাকার পানওয়ালা?

—স্টেশনের।

—স্টেশন? সে তো অনেক দূর! কোন স্টেশন?

—আজ্ঞে, নন্দীগ্রাম।

—নন্দীগ্রাম…নন্দীগ্রাম…সে আবার কোথায়?

—ওই তো ওখানে!…বলে আঙুল দিয়ে পিছনের দিকটা দেখাতে গিয়ে চোখে পড়ে বড় বড় বাড়ি। ফ্যালফ্যাল করে তাকাই। বাড়িগুলো কোন আক্কেলে নন্দীগ্রাম স্টেশনটাকে পাপ করে ফেলল, বুঝি না। ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলে সেদিকে হাঁটতে থাকি। নন্দীগ্রাম স্টেশন খুঁজে বের করার জেদ চাপে। যাকে সামনে পাই, জিজ্ঞেস করি। কেউ বলতে পারে না। মানিব্যাগের জন্য দুঃখ হয়। আমার খাওয়া হচ্ছে না। এত খিদে নিয়ে হাঁটব কেমন করে? কখন হঠাৎ বুদ্ধি খুলে যায়। রেললাইনটা পেয়ে গেলেই তো স্টেশনটা পেয়ে যাব। চেঁচিয়ে উঠি—শোভানাল্লা। একে ওকে জিজ্ঞেস করি। বলে ওদিকে। সেদিকে গিয়ে দেখি সত্যিকারের রেলফটক। রেললাইনের পাশ দিয়ে হাঁটতে থাকি। তারপর তীব্র হুইসল শুনে পিছনে ঘুরি। লাফ দিয়ে নীচে চলে যাই। এই রে! আর একটু হলেই মারা পড়েছিলুম। বেঁচে যাওয়ার আনন্দে রেলগাড়িটাকে হাত নেড়ে বলি—ধন্যবাদ ভাই!

কয়লাকুড়নো মেয়েটা বলে—এই শোভানাল্লা! কোথায় যাচ্ছিস?

সন্দেহাকুল চোখে ওর দিকে তাকাই। বিশাখা নয় তো—ছদ্ম বেশে? নাকি বিশাখা আমার মতো ভুল করে কয়লাকুড়োনির শরীর নিয়ে বিপদে পড়ে গেছে?—কী রে শোভানাল্লা? অমন করে তাকাচ্ছিস কেন?

তখনই সন্দেহ কেটে যায়। হি হি করে হাসি। এ মাগী বিশাখা নয়।

রেললাইন ধরে যাচ্ছি তো যাচ্ছি। হঠাৎ টের পাই, পীচের রাস্তাটাকে জোর ফাঁকি দেওয়া গেছে। অমনি আনন্দে কোমর দুলিয়ে নাচ জুড়ে দিই। কখনও নাচ থামিয়ে তার উদ্দেশ্যে পাথর ছুড়ি। তারপর কে বা কারা দৌড়ে আসে।—এ্যাই বাঞ্চোৎ শোভানাল্লা! ঢিল ছুড়ছিস কেন?

—আমার খুশি।

—খুশি? শালার পাগলামি ঘুচিয়ে দেব।

আমি স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে থাকি। আমাকে এরা পাগল বলছে। আমি পাগল? ক্ষেপে গিয়ে চেঁচাই—তুই পাগল। তোর বাবা পাগল। তোর মা পাগল।

তারা হাসে। কেউ বলে—এই শোভানাল্লা! তোর বাড়ি কোথায়?

—বলব না।

বলে গোঁ ধরে হাঁটতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ি। ককিয়ে উঠি উঃ! বড্ড লেগেছে। হাঁটু দুটো ছড়ে গেছে। হঠাৎ চোখ যায় পাজামাটার দিকে। কেউ খেয়ে ফেলেছে অনেকটা। আমিই কি? আর, কী বিচ্ছিরি ময়লা—কালো। শুঁকে ওয়াক থুঃ করি। গায়ের গেঞ্জিটাও যে তাই। —বকুল কেচে দেবেখন, আপন মনে মনে বলি। বকুল খুব লক্ষী মেয়ে।

তারপর হাঁটতে গিয়ে দেখি কষ্ট হচ্ছে। রেললাইন করেছিস, বেশ করেছিস। তাই বলে এত পাথর রেখেছিস কেন? আমার বুঝি কষ্ট হয় না? থুথু ফেলি ঘেন্নায়। গলা শুকিয়ে আছে, থুথু নেই। জল খাব।

আবার আছাড় খাই। জলের কথা পরে। আপাতত এই শালাকে নিয়ে পড়া যাক! পাথরগুলোর দিকে কটমট করে তাকাই মনে হয় অজস্র দাঁত খুলে রেললাইন হাসছে! হাসছে—অথচ কোন আওয়াজ নেই! পারে বটে! কালো ক্ষয়াখর্বুটে ধরণের এমন নিষ্ঠুর হাসি কীভাবে হাসে?

পীচের রাস্তার জন্যে এতক্ষণে দুঃখ হয়! পীচের রাস্তা! তোমাকে আবার ফিরে পেতে চাই। পীচের রাস্তা—লক্ষীটি দয়া করো ভাই!

কষ্ট হয় হাঁটতে, পীচের রাস্তাটা খুঁজে বের করতেই হবে! কতদূর যাই! দিন রাত মাস বছর! পীচের রাস্তা! কেন এমন করিস ভাই? ঘাট মানছি—নাক কান মলছি! আর কখনও এমন করব না! ঠাট্টাতামাসাও বুঝিস নে—এমন বেরসিক কেন রে?

পৃথিবী অন্ধকার হয়ে আসে! আকাশে নক্ষত্রের দরজা খুলে বেরিয়ে আসে একে-একে! তাদের উদ্দেশ্যে বলি—আমায় দয়া করুন আপনারা। বড্ড বিপদে পড়ে গেছি!

ঘাসের ওপর বসে দুহাত জোড় করে বসে থাকি—মুখ তুলে দয়া চাই! কখন শুয়ে পড়ি চিত হয়ে! বুকের ওপর জোড়করা হাত রাখতে ভুলি না!

বাচ্চা মেয়েটা চলে যেতেই দ্রুত এদিক ওদিক দেখে নিই! তারপর পা টিপে টিপে এগিয়ে যাই! বসি। দুহাতে শালপাতাগুলো সরাতে থাকি। শোভানাল্লা।

ছহাতে মুখে পুরি ঝোলমাখানো ভাত! এত ক্ষিদে নিয়ে মানুষ বাঁচে? একটা নেড়ী কুকুর জিভ বের করে ভয়ে-ভয়ে হাসে। বলি—দেখছিস কী? চলে আয়। বসে পড়।

ছজনে ছদিক থেকে খাই। বুঝতে পারি, ও আর ভয় করছে না। মহাতৃপ্তিতে খাওয়াটা হয়ে গেলে জল খুঁজি। টিউবেল দেখতে পাই। লোকগুলো বলে—টিপে দে রে! শোভানাল্লা জল খাবে।

জল খেয়ে ঢেকুর তুলে মনে হয় একটা সিগারেট খাওয়া উচিত। মানিব্যাগটা খুঁজি। পাইনে। পকেটই নেই। যাক্ গে। এখন মাথা খুঁড়ে মরলেও উপায় নেই। সিগারেটের দোকানের কাছে দাঁড়িয়ে থাকি। তারপর আয়না চোখে পড়লেই আঁতকে পালিয়ে যাই। রাস্তা খুঁজতে খুঁজতে হাঁটি। ধোঁয়া দেখলেই চেঁচিয়ে উঠি—শোভানাল্লা!

ওদের বড্ড দয়া। পোড়া সিগারেট চোঁ চোঁ করে টানি। গলগল করে ধোঁয়া ছেড়ে আরাম পাই। গাছের ছায়ায় গিয়ে বসি। ছেলেপুলেরা এসে ডাকাডাকি করে—এই শোভানাল্লা! তোর ঘোড়া কই!

ঘোড়া! চমকে উঠি। ওদের দিকে তীব্র দৃষ্টে তাকাই।

—শোভানাল্লা! তোর ঘোড়া খুঁজে পেলি!

মাই গুডনেস! নীল ঘোড়া! তাই তো! খুব মনে পড়িয়ে দিয়েছে। উঠেই দাঁড়াই। ভেবে পাইনে, ঘোড়াটার কথা ওরা কী ভাবে টের পেল। এক পা ছ পা করে ওদের দিকে এগিয়ে যাই। ওরা পিছিয়ে যায়। সস্নেহে বলি—আহা, পালাচ্ছিস কেন। আমি বাঘ না ভালুক? কথা শোন্ না বাবা।

রাঙা ফ্রকপরা ফরসা গোলমাল মেয়েটি বলে—শোভানাল্লা! শোভানাল্লা! তোমার গোলা কই?

—উঃ! হল না। শো—ভ—ন্—নাল্—লা! বলো—বলো...

সবাই এক সঙ্গে বলে ওঠে। অমনি নাচ জুড়ে দিই। গান গাইতে থাকি—টু নাইট হাণ্ডেড মাইলস ফর ইউ—উ—উ! ইয়া ইয়া ইয়া আহ্‌ ইয়াঃ? আহ্‌ ইয়াঃ!

কেউ বলে ওঠে—ওরে! দস্তুর মতো এজুকেটেড রে। শোভানাল্লা!

—কোন বড় লোকের ছেলে টেলে হবে, মাইরি!

—হবে। কোন ধনী মুসলমান ফ্যামিলির!

আমি থেমে গিয়েছিলুম। এবার ঘুষি পাকিয়ে তাড়া করি।—খবর্দার! জাত তুলে কথা বললে খুন করে ফেলব।...

একদিন ভিড়ের মধ্যে ঠেলে বেরিয়ে যেতে-যেতে চমকে উঠি। শোভানাল্লা! ওই তো বিশাখা! আমার কী যে হয়ে যায়। খপ করে তার হুহাত চেপে ধরি চেঁচিয়ে উল্লাস প্রকাশ করি—বিশাখা!

তারপর খুব গণ্ডগোল হল। লোহার মতো শক্ত রঙীন বেলুন—অজস্র বেলুন এসে আমার ওপর পড়তে থাকল। কুপোকাৎ হয়ে গেলুম। অতগুলো ভারি বেলুন! চারদিক থেকে ঝাঁকে-ঝাঁকে এসে পড়ছে। আমি তো ভেবেই পাই নে কী-ভাবে বেরুব। এরই মধ্যে বিশাখা হারিয়ে গেল আবার। কতক্ষণ পরে দেখি শুয়ে আছি। আমার কী আক্কেল! দিব্যি শুয়ে আরাম করছি! উঠে বসতে গিয়ে টের পাই, আমার শরীর চুরি গিয়েছে। শরীরটা কে চুরি করল? বেলুন গুলো চিঁড়ে চেপ্টা হয়ে আটকে আছে এই ফলস্‌ বডিতে। চিটচিটে আঠালো লাল বেলুন কুচো। বড্ড ব্যথা।...

চিত হয়ে শুয়ে চোখ বুজি। প্রার্থনা করি জোড় হাতে। আমায় দয়া করুন আপনারা। নক্ষত্রগণ, আকাশ! যথেষ্ট দেখা হল পৃথিবীকে। আর এখানে নয়। দয়া করে আমায় নিয়ে যান আপনারা।

আকাশ আর নক্ষত্রগণ অবশেষে দয়া করেন। টের পাই, কোথাও আমাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কিন্তু ট্রেনে কেন? যা বাবা! এ তো ট্রেনের কামরা! হাত বুলিয়ে লালচে কাঠ পরখ করি। ভেবেছিলুম নরম পালকের মতো হবে আমার আসন। পাছা ব্যথা করে যে! আপনারা বড্ড নিষ্ঠুর, স্যার!

—এই! একটু সরে বসো!

তাকিয়ে দেখি, রোগা একটা লোক। লম্বা নাক। লম্বা নাক মানেই নির্বুদ্ধিতা। একটু হাসি। সরে বসি। সে ভুরু কুঁচকে মুখ ফিরিয়ে থাকে। একটু হেসে বলি—ট্রেনটা কোথায় যাচ্ছে দাদু?

—শেয়ালদা। তুমি কোথায় যাবে?

শেয়ালদা! অমনি চেঁচিয়ে উঠি—শোভানাল্লা! তারপরই নিজের কণ্ঠস্বর—এরকম চেঁচিয়ে ওঠাটা বড্ড বিচ্ছিরি লাগে—সভ্যতাবিহীন। সঙ্গে সঙ্গে মুখে হাত চাপা দিই। স্পিকটি নট। শেয়ালদা! গলার ভিতর কথাটা ঘুরে বেড়ায়। আবছা অনেক ছবি মনে ভেসে ওঠে। চেনা-অচেনা কত সব মুখ আর মানুষ। ননীদা। ইকবাল। তপু। নীরেন। বাচ্চু!

ফের সব অচেনা লাগে। কারা এরা? সব্বাইকে তাড়িয়ে দিই। দূরে সরে যায়! আবার কিন্তু আসে। ননীদা হাসতে হাসতে বলেন—সোনার রাধাকৃষ্ণ। বারোটা মুক্তোর মালা।

ঠোঁটে আঙুল রেখে ফিসফিস করে বলি—চুপ্।

—সোনার রাধাকৃষ্ণ। বারোটা মুক্তোর

—প্লীজ। চুপ। কে শুনতে পাবে।

—সোনার রাধাকৃষ্ণ। বারোটা...

সারাপথ এভাবে ননীদা আমাকে জ্বালাচ্ছে। তার মধ্যে আবার ইকবালটা এসে গেল।—এ্যাই বাণ্ডিল! বাপ্পোৎ তোর টিপস্ কোথায়?

বাণ্ডিল! আমি মাথা দোলাই। মনে পড়ে না—অথচ চেনা লাগে।

—বাণ্ডিল! কোথায় ফেললি টিপ্‌স?

—চুপ্‌, চুপ্‌।

—বল্‌ না শালা, খুঁজে নিয়ে আসি।

—রেল-পুকুরের জলে। নন্দীগ্রাম স্টেশনে।

—বুদ্ধু কোথাকার!

—ইকবাল, আমি মাইরি মুকুল হয়ে গিয়েছিলুম। সে এক মজার ব্যাপার।

তপু নীরেন বাচ্চুরা সামনে দাঁড়িয়ে বলে—ট্রেচারাস! তুই ননীদাকে খুন করেছিস।

জোরে মাথা নাড়ি।

—তুই এগারো নম্বর বডি হয়ে পড়ে ছিলিস, আর ননীদা...

—চুপ্‌, চুপ্‌।

চোখ খুলে দেখি অনেক লোক। ট্রেনের কামরা। কিছুক্ষণ বুঝতে পারি না। তারপর মনে পড়ে শেয়ালদা যাচ্ছি। একটু ভয় করে এবার। সেই ভয় দ্বিগুণ চৌগুণ অনেকগুণ হয়ে বিশাল ব্ল্যাকবোর্ডে জটিল ভগ্নাংশের মতো কিছুক্ষণ সামনের সব কিছু আড়াল করে রাখে। আর ওই ব্ল্যাকবোর্ডের ভয়ের আঁক মুছতে মুছতে পা ফেলি। তারপর দু-হাতে প্রচণ্ড ধাক্কায় ব্ল্যাকবোর্ডটা উল্টে ফেলে দিতেই শোভানাল্লা!

উজ্জ্বল রোদেভরা পুরনো পৃথিবীর থেকে ঝড়ের বেগে আবার হট করে খোলা ঘরের মধ্যে হুড়মুড় করে কত কী ঢুকে পড়ে। হাঁ করে তাকিয়ে থাকি। কিছু চিনি কিছু অচেনা লাগে। খুব ব্যস্ত হয়ে গোছাতে থাকি। ধুলো ময়লা ঝেড়ে তুলে নিই। যা যেখানে ছিল, ছত্রখান। ফিরিয়ে দেওয়া জিনিসের স্তূপ থেকে বেছে নিয়ে গুরুত্ব অনুসারে সাজিয়ে রাখি।

তারপর মন খারাপ হয়ে যায়। তেঁতো লাগে সব কিছু। চুপচাপ বসে থাকি।···

কারা ব্যস্ত হয়ে ঢোকে তারপর নাড়াচড়া করে বেরিয়ে যায়। ট্রেনের কামরা ফাঁকা হয়ে পড়ে। উর্দিপরা ঝাড়ুদার আমার দিকে ঝেঁটা তুলে ধমক দেয়, এ পাগলা! উতর যা বে। জলদি উতর যা।

দুঃখে চোখ ফেটে জল আসে। আস্তে আস্তে নেমে আসি। গেটের ভিড় ঠেলে বেরিয়ে পড়ি। কেউ আমার দিকে তাকায় না। হাজার হাজার মানুষের মধ্যে নিজেকেও একজন মানুষ ভেবে মন খারাপ ভাবটা তখনি কেটে যায়। সমুদ্রে অনেক দিন কাটিয়ে এসে যেন দ্বীপে নামার আনন্দ আমাকে খুব জোরে পা ফেলতে সাহায্য করে। অথচ বড় আড়ষ্টতা হয়। দু-হাতের আঙুল দেখতে দেখতে হাঁটি।

মধু মিস্তির লেনের মোড়ে পৌঁছে গোড়া বাঁধানো কাঞ্চন গাছটার তলায় একটু দাঁড়াই। বসন্ত কাফের বেঞ্চে বসে কারা অড্ডা দিচ্ছে দেখতে পাই। ওদের মধ্যে কি বাণ্ডিল আছে? তখনই ধরা পড়ে, আমিই বাণ্ডিল। তখন সাবধানে সরতে থাকি। ওদের একজন ঘুরে তাকানোর সঙ্গে সঙ্গে অন্যদিকে কেটে পড়ি। হরগৌরী লণ্ড্রির সামনে দিয়ে জোরে বেরিয়ে যাই। কর্তার সিং গ্যারেজের পিছনে আমাদের মেসবাড়ী। ভয়ে ভয়ে এগোতে থাকি। গেটের কাছে যেতেই মনে হয় আমি খুব একটা নিরাপদ নই। অমনি রাস্তা ডিঙিয়ে আবার উল্টোদিকের ফুটপাতে যাই। পুরনো পৃথিবীর চারপাশ থেকে চোখ কটমট করে তাকায়। অনর্গল আমাকে শাসাতে থাকে। লম্বা লম্বা পা ফেলে হাঁটি। তারপর একটা পার্কে ঢুকে পড়ি।···

যতক্ষণ না আলো জ্বলে ওঠে অপেক্ষা করি।

রাজাবাজারের দিকে যখন এগোচ্ছি, তখনই আমার মধ্যে ভদ্রতাবোধ জেগে গেল। খুব লজ্জায় আড়ষ্টা হয়ে পড়ি। এভাবে

ইকবালের বাড়ি যাওয়া যায় না। ইচ্ছে করে, কাকেও অনুরোধ করি—দয়া করে ভদ্রগোছের একটা পরার মত যা হোক কিছু দেবেন? কথাটা মুখস্থ করতে থাকি। কিন্তু কাকেও বলা হয়ে ওঠে না।

গলিতে ঢুকে প্রায় চোখ বুজে হাঁটি। ফুটপাতের ওপর দরজায় কড়া নাড়ি। একটা বাচ্চা মেয়ে দরজা খুলেই আঁতকে ওঠে। ভুরু কুঁচকে বলে—যা যা! ভাগ্!

কথা বলার আগেই সে দরজা বন্ধ করে দেয়। তখন মরিয়া হয়ে সেখানেই বসে পড়ি। আমাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে মানুষের ছায়াগুলো এদিকে-ওদিকে চলে যায়। একটা ব্যাণ্ডপার্টি আসতে থাকে। কতক্ষণ কান ঝালাপালা। আমার পা ডিঙিয়ে মিছিল যায়। আবার স্তব্ধতা। সামনের দোকানে শিকে গাঁথা পোড়া মাংসের গন্ধ নাকে লাগে। আবার কতক্ষণ পরে একটা কুকুর এসে প্রচণ্ড বকাবকি শুরু করে।

তারপর আমার পিছনে কেউ কড়া নাড়ে। ঘুরে দেখে আস্তে ডাকি—ইকবাল!

ইকবাল অমনি ঘুরে দাঁড়ায়। দীর্ঘ কয়েক মিনিট সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টে আমাকে দেখে। তারপর। একটু ঝুঁকে বলে—তুমি বাণ্ডিল না?

চাপা গলায় বলি—ইকবাল। আমাকে তুমি বলছিস কেন রে?

—আরে ব্বাস! বাণ্ডিল এ কি রে? বলে সে হতভম্ব হয়ে যায় যেন। কি করবে ভেবে পায় না। সিগারেট বের করে দ্রুত জ্বালে। নিঃশব্দে টানতে থাকে। ওর চোখ আলোয় চকচক করে। মাঝে মাঝে আমার দিকে আড়চোখে তাকায়।

আমি একটু হেসে আবার বলি—ইকবাল, আমি বাণ্ডিল!

একটা অশ্লীল গাল দিয়ে বসে সে। তারপর সিগারেটটা

পায়ের তলায় ঘষে নিভিয়ে ফেলে। বলে—কোন মানে হয় রে শালা ?

সে দরজার কড়া নাড়ে। আমি দুঃখিত হয়ে পড়ি। ইকবাল কি আমাকে অস্বীকার করল ? দরজা খুলে যায়। সে ঢুকে পড়ে। দরজাটা বন্ধ হয়ে যায়।

একটু পরে আবার দরজা খোলে। সে প্রায় লাফ দিয়ে বেরোয় এবং আমার ঘাড় খামচে ধরে চাপো গলায় গর্জে বলে—আয় শালা !

বাড়ির উঠোনে গিয়ে দেখি, চারদিকের উঁচু বারান্দায় কারা আমার জন্য অপেক্ষা করছিল হয়তো। ইকবাল সটান আমাকে চৌব্বাচ্চার কাছে নিয়ে যায়। ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়। আঃ করে উঠি। ইকবাল গর্জায়—চোপ্ শালা। চুপ করে বসে থাক্।

সে আমার সামনে দাঁড়িয়ে পোশাক খোলে। তারপর সেগুলো সেই বাচ্চা মেয়েটির দিকে ছুঁড়ে দিয়ে একটা মগ হাতে নেয়। অমনি টের পাই ওর উদ্দেশ্যে। পালাবার চেষ্টা করি। আমার কাঁধ ধরে বসিয়ে দেয়। আমি ছটফট করি। সে আমার মাথায় জল ঢালতে শুরু করে।

জল ঠাণ্ডা নয় টের পেয়ে তখন চুপ করে থাকি। ইকবাল কাকে ডেকে বলে—আমার ঘর থেকে সাবান নিয়ে আয় !...

মিষ্টি বাজনার শব্দে চোখ খুলি। প্রথমে কিছুক্ষণ কিছু বুঝতে পারি না। তারপর দেখি আমি বিছানায় শুয়ে আছি। খুব অবাক লাগে। বিছানায় দু-হাত বুলিয়ে পরখ করি। মুখ তুলে দেখি একটু তফাতে আরেকটা তক্তাপোশে ইকবাল ঘুমিয়ে আছে।

তাহলে আমিও ঘুমিয়েছি। শোভানাল্লা বলতে গিয়ে সামলে নিই। পাশের ঘরে কেউ রেডিও বাজাচ্ছে। কিছুক্ষণ ঘরের ভেতরটা দেখার পর অনেক কথা মনে পড়তে থাকে। তখন দিশেহারা

হয়ে চোখ বুজি। ঘুম আসছে। ঘুমের মধ্যে তলিয়ে যেতে যেতেও বুঝতে পারি আমি নিরাপদ।

ইকবালের ডাকে ঘুম ভাঙে। ঘরে রোদ্দুর আসছে। মুখে রোদ্দুর পড়েছে। ধুড়মুড় করে উঠে বসি। ইকবাল কাঁধে হাত রেখে বলে—চুপচাপ বস্। চা খাবি?

—মুখ ধুয়ে খাব। খুব ভদ্র ও বিনীতভাবে বলি।

ইকবাল হাসে।—শালা গুয়ে মুতে এ্যাদ্দিন কাটিয়ে এসে বলে কিনা মুখ ধুয়ে খাব!

আমি কিন্তু কিছু বলি না! বলার কথা খুঁজে পাই না। ইকবালের সিগারেটের দিকে তাকিয়ে থাকি। ইকবাল পুনঃ সিগারেটটা সরিয়ে নিয়ে বলে—খবর্দার, লোভ করবি নে। ব্রেন আবার বিগড়ে যাবে। মুখ ধুয়ে নে। চা-ফা খা। তারপর···

ওর মুখে ভাবনার ছাপ লক্ষ্য করি। একটু পরে সে বলে—ঠিক আছে। বাড়িতেই নাপিত ডেকে আনব'খন। সেলুনে গিয়ে কাজ নেই। বাইরে কিছুদিন না বেরনোই ভালো রে!

—কেন?

ইকবাল শাসানির ভঙ্গীতে বলে—কেন তা জানো না? ন্যাকা শালা! তপুরা পেলে গেঁথে ফেলবে জানো?

—কেন?

—ননীদার জন্যে।

—ননীদার জন্যে? কেন রে?

ইকলাল সন্দেহাকুল দৃষ্টিতে আমাকে দেখতে দেখতে বলে—এখনও শালার ব্রেন ক্লিয়ার হয় নি। কাল রাতে তো বেশ কথাবার্তা বললি! আবার গুবলেট হয়ে গেল?

—হুঁ। মনে পড়েছে। সোনার রাধাকৃষ্ণ, গলায় বারোটা মুক্তোর মালা···

—চুপ। আয়, মুখ ধুবি।···বলে ইকবাল উঠে দাঁড়ায়। আমি

নামি। আমার পরনে রঙীন পাজামা। গায়ে একটা ডোরাকাটা হাওয়াই শার্ট। হাত বুলিয়ে দেখতে দেখতে সঙ্গে যাই। সে ফের বলে—চিনতে পারছিস না? মনে পড়ছে না কিছু?

—উঁ?

—আরে শালা, আমাদের বাড়িটা।

—মনে পড়েছে।

—দেখিস, সিঁড়িটা ভাঙাচোরা। পড়ে যাস নে রাতের মতো।

কাঠের সিঁড়ি বেয়ে সাবধানে নামি। সিঁড়িটা প্রতি ধাপে আমাকে সব মনে করিয়ে দিতে থাকে। নীচের উঠোনে চৌবাচ্চায় বাড়ির ভাড়াটেরা স্নান করছে। মেয়েরা থালা বাসন হাঁড়িকুড়ি নিয়ে একটু তফাতে বসেছে। ইকবালদের বাড়ি। তাই ইকবাল যা খুশি করে। ওকে সবাই বড্ড ভয় করে। এইসব কথা মনে পড়ে যায়।

ইকবাল বারান্দার নীচে একটা ধাপে আমাকে দাঁড় করিয়ে রেখে বলে, এক মিনিট। নাপিত ডেকে আনি! শালার চুল দাড়ির মধ্যে এখনও যা ময়লা! ছ্যাঃ

রাতে আয়নার সামনে একবার দাঁড়িয়েই ভয় পেয়ে সরে গিয়ে ছিলুম। মনে পড়তে থাকে। ইকবাল বলেছিল—ঘুমোবার চেষ্টা কর। ঘুম হলেই সব সেরে যাবে। ঘুম হলেই জানবি সেরে গেছিস। ঘুম হয় না বলেই তো লোকে পাগল হয়ে যায়।···

আমি ঘুমিয়েছি! হয়তো কতকাল ঘুমোই নি। এই প্রথম ঘুম। আমি সেরে গেছি। খুশি হয়ে উঠি। সবার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করব। কারও বিরুদ্ধে বিদ্বেষ রাখব না। শত্রুদের ক্ষমা করে চলব। এইসব প্রতিজ্ঞা করতে থাকি। বাড়ির লোকেরা আড়চোখে আমাকে দেখতে থাকে। আমার বড় লজ্জা হয়। মুখ নীচু করে থাকি।

একটু পরেই ইকবাল নাপিত নিয়ে আসে। চোখ তাকিয়ে বলে—খবর্দার! একটুও নড়বিনে। চোখ বুজে বসে থাকবি।

আমি বসি। নাপিত আমার চুলে হাত রাখে। অস্বস্তি হয়। ইকবাল বলে—একদম সাফ করে দাও।

আমার মাথা জলে ভিজিয়ে দেয় লোকটা। তারপর ক্ষুর বের করে। ভয়ে চোখ বুজি। একটু পরে টের পাই, ইকবাল পিছন থেকে আমাকে ধরে আছে। আমার মাথায় অস্বস্তিকর জ্বালা। কিছুক্ষণ পরে লোকটা বলে—ব্যস!

সে আমার দাড়িতে সাবানের ফেনা জমিয়ে তোলে। আবার চোখ বুজি। গলায় ক্ষুরটা আসতেই শিউরে উঠি।

একটু পরে ইকবাল বলে—বাঃ! অপূর্ব হয়েছে! আয়—চানটাই সেরে নে বরং।

উঠোন থেকে একটা লোক হাসতে হাসতে বলে—ইকবালসাব! আভি হাম পছান্‌তা! বাণ্ডিলবাবু হ্যায় না?

—হ্যাঁ শরীফভাই!

—বাণ্ডিলবাবু! হামকো পছান্‌তা আপ?

মাথাটা দোলাই। সেইসময় পিছন থেকে কোন মহিলা বলেন—ইকবাল! ওকে বার বার চান করাচ্ছিস, ঠাণ্ডা লেগে যাবে না?

ঘুরে দেখে চিনতে পারি। ইকবালের বিধবা বোন রোজি। বলি—রোজিদি, ভাল আছেন?

রোজিদি একটু হেসে বলেন—এতক্ষণে চিনতে পারলে ভাই? রাত্তিরে অত করে জিগ্যেস করি—মাথা নাড়ে। না, চিনতে পারছি না তো।

আমাকে কেন্দ্র করে বাড়িজুড়ে কথাবার্তা শুরু হয়। ইকবাল বলে—আয় বে! আবার একদফা সাফ করি তোকে।

আপত্তি করি না। নাপিত দু-হাতে একগাদা কালো নরম জিনিস—আমারই অন্য এক জীবনের ভগ্নাবশেষ ফেলে দিতে যায়

ডাস্টবিনে। চৌবাচ্চার কাছে বসি। ইকবাল বলে—নিজে নিজে ধো। শালা বাপের চাকর পেয়েছে!

স্নান করতে আরাম লাগে। গা মুছে দেখি ইকবালের ছোট বোন একটা পরিষ্কার পাজামা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে হেসে অভিবাদন জানাই।

ওপরে কি ভদ্রভাবে বসি। ইকবাল বলে—এবার আয়নার সামনে গিয়ে দ্যাখ্ অবস্থাটা! যা না রে! দ্যাখ্ গিয়ে।

ভয়ে ভয়ে তাকাই। তখন ইকবাল আমাকে জোর করে ড্রেসিং টেবিলের সামনে নিয়ে যায়। চোখ বুজে থাকি। সে কাতুকুতু দিলে চোখ খুলি। তারপর ন্যাড়ামাথা দাড়িগোফহীন ফ্যাকাসে লোকটাকে দেখে অবাক হই। মাথায় অজস্র ক্ষতচিহ্ন—গালে সদ্য কেটে যাওয়া লাল রেখা—কপালে কানের নীচে চোয়ালে অনেক টুকরো কালচে দাগ। ইকবাল পাশে দাঁড়িয়ে বলে—এই নতুন ঘাগুলো কিসের—মনে পড়ছে?

মাথা নাড়ি।

—পাগলামি করতে গিয়ে খুব মার খেয়েছিলি লোকের হাতে।

—মনে নেই রে!

ইকবাল সরে এসে বিছানায় বসে। বলে—হুঁ, ওই রকমই তো হয়। যাক্ গে, ও নিয়ে ভেবে লাভ নেই। আয়, ব্রেকফাস্ট করা যাক্।

দাঁড়িয়ে খুব সাহসের সঙ্গে আয়নার লোকটাকে দেখি। তার দু চোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। মনে মনে বলি—তাহলে তুমিই বাণ্ডিল? এতদিন কোথায় ছিলে?

—আয়। চা জুড়িয়ে যাচ্ছে।

—যাই। বলে আস্তে আস্তে সরে আসি। শরীর এতক্ষণে বেশ দুর্বল লাগে। মনে হয়, আর বেশিদিন বাঁচব না। অথচ আমার বেঁচে থাকা এত দরকার মনে হয়।...

সি/বারো

ইকবাল আমাকে বাইরে বেরোতে দিচ্ছে না। সে যখন চলে যায়, বাড়ির লোকেরা আমার দিকে কড়া নজর রাখে। আমারও বেরাতে ইচ্ছে করে না। দোতালার জানালা থেকে রাস্তা দেখি। কৃষ্ণচূড়ার শেষ ফুলটা ঝরে পড়াও দেখতে পাই। তার তলা দিয়ে নির্বিকার মানুষেরা হেঁটে যায়। বুঝতে পারি না এত ব্যস্ততার কী আছে। কখনও জানলা থেকে সরে এসে ক্যালেণ্ডারের তারিখ দেখতে থাকি। জুন মাসের দিনগুলো একটার পর একটা চলে যায়। কী একটা প্রতীক্ষা জেগে ওঠে মনে। কী যেন ঘটাবে— কিছু একটা ঘটবেই। এমন চলতে পারে না—অসম্ভব।

ইকবাল বলেছে, অন্তত কিছুদিন কাটিয়ে দে। সামনে জুলাইয়ের মাঝামাঝি তোকে নিয়ে কানপুর যাব। আমার এক দাদার ব্যবসা আছে ওখানে। ওখানেই একটা কিছু জুটিয়ে দেব। এখন আপাতত তোর স্বাস্থ্যটা ঠিক করা দরকার। ভালভাবে খাওয়া-দাওয়া কর। গায়ে জোর আসুক।

সেই প্রতীক্ষাই কি? একটু ভেবে মনে হয়—না অন্য কিছুর পথ তাকিয়ে আছি। তা আরও মহান, আরও চমৎকার!

কিন্তু কবে আসবে সেই সু-দিন? আমি যে শিগগির বুড়ো হয়ে যাচ্ছি। যে চুলগুলো গজাতে শুরু করেছে, ভাবনা হয়—সবগুলো সাদা হয়ে যাচ্ছে কিনা। আবার ক্রমশ অস্থিরতা জাগে। পায়চারি করি। রাতে আর তেমন করে ঘুম হয় না। স্বপ্ন দেখি। কত সব অদ্ভুত স্বপ্ন। কিছু মনে থাকে কিন্তু ভুলে যাই। স্বপ্নগুলো দিনে বা জেগে থাকার সময় ফিরে আসে আবার। আমাকে চারদিক থেকে ভীমরুলের ঝাঁকের মতো ঘিরে ধরে। ছটফট করি।...

একরাতে বকুলকে স্বপ্ন দেখলুম। যখন দেখছিলুম তখন কিছু মনে হয় নি। জেগে গিয়ে টের পেলুম বকুলকে স্বপ্ন দেখেছি। কিন্তু কিছুতেই মনে পড়ল না স্বপ্নটা কেমন ছিল। কবেকার শোনা গানের কলির মতো একটা সুর বাজতে থাকল সেই স্বপ্নের স্মৃতিতে। কথা নেই, শুধু সুরটাই যা আছে। মন কেমন করতে থাকল। বাকি রাত আর ঘুম হল না। অনর্গল কথা বলে যাই মনে মনে, বকুলের সঙ্গে—কখনও তাকে চেনা লাগে, কখনও চিনতে পারি না। অবাক হয়ে চুপ করে যাই। কার সঙ্গে কথা বলছি? আবার বকুল এসে সামনে দাঁড়িয়ে। চোখ বুজে আছি দেখে সে ফিসফিস করে ডাকে—মুকুল! মুকুল!

তাকে হঠাৎ বদলে যেতে দেখি। কয়লাকুড়ুনী মেয়েটি বলে—এই শোভানাল্লা! কোথায় যাচ্ছিস? শ্বশুরবাড়ি?

—আরে ধুর ধুর! বোনের বাড়ি যাচ্ছি—বোনের বাড়ি।

—তোর আবার বোনের বাড়ি আছে? ও শোভানাল্লা! কোথায় তোর বোনের বাড়ি?

—বকুলতলা! নন্দীগ্রাম স্টেশন থেকে ওই তো মোটে এক কিলোমিটার!

—ও শোভানাল্লা! বোনের বাড়ি যাচ্ছিস—তো খালি হাতে?

—আরে না, বা! খালি হাতে বোনের বাড়ি যায় কেউ? বলবে কি লোকে!

—এই শোভানল্লা! ও কি রে! ছি ছি! ফেলে দে! ফেলে দে!

দুটো হাত ব্যস্তভাবে ঝাড়ি। ফুঁ দিই! তারপর গুম হয়ে বসে থাকি কতক্ষণ! একটা ছোট ফ্রকপরা মেয়ে এসে ডাকে—তোবানাল্লা! তোবানাল্লা! তোমাল গোলা কই!

—এই যে খুকু! এস! এস! তোমার ঘোড়া? ঘাস খাচ্ছে। বুঝেছ? মাঠে ঘাস খাচ্ছে।

—গোলাল পিতে তাপো না তোবানাল্লা।

—এই ছ্যাখো—এই ছ্যাখো···হুঁ-উ-উ ব্যস।

হঠাৎ কি একটা শব্দ হল। কাঠের সিঁড়িতে—তারপর দরজার দিকে। তাকাই। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারি না। দরজা ফাঁক করে মুখ বাড়িয়ে দিয়েছে—অবিশ্বাস্য অসম্ভব একটা ঘোড়ার মুখ, ঘন নীল তার রঙ, দুই চোখ লাল—হলুদ কাজল পরা সেই চোখ দুটো, এবং তার ফোঁস-ফেঁসে শ্বাস-প্রশ্বাস শুনতে পাই।

নীলঘোড়া! এ্যাদ্দিন কোথায় ছিলিস তুই?

আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে এগিয়ে যাই। দরজার কাছে যেতেই সে মুখ টেনে নেয়। সিঁড়িতে তার খুরের চাপা শব্দ হয়।

সাবধানে ছিটকিনি খুলে বেরিয়ে পড়ি। সিঁড়ি থেকে তখন সে উঠোনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। শেষ রাতের ফিকে বাল্বের আলোয় তার নীল রঙ থেকে জ্যোতি বেরুচ্ছে। তার স্ফীত লেজের চামর থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে নীলাভ তড়িৎ কনিকা। আমি যত এগোই, সে সমান তফাৎ রেখে চলতে থাকে।

নির্জন রাস্তার ল্যাম্প-পোস্ট থেকে আলো কেড়ে নিয়ে বিচ্ছুরিত নীল জ্যোতি চার পায়ে কদম ফেলতে থাকে। শব্দহীন রাস্তায় খুরের ধ্বনি ওঠে খট্ খটাখট্...খট খট খটাখট···

নীল ঘোড়া। আমি চেঁচিয়ে উঠি। দৌড়তে থাকি। আমার পাশ দিয়ে ঝড়ের মতো ছোট-বড় মোটরগাড়ি বেরিয়ে যায়। নীল ঘোড়া! আবার চিৎকার করি। সে সমানে ছুটে যেতে থাকে। খুরের শব্দ দূরে সরতে থাকে খট্ খট্ খটাখট্···খট্ খট্ খটাখট...

—মিস মৈত্র, হোয়াট এ্যাব্যাউট দা বডি নাম্বার, ইলেভেন

—স্যার, এখনও কেউ আসে নি।

—এনি ডাইং স্টেটমেণ্ট?

—অন দা স্পট বলেছে শুনলাম—বাণ্ডিল। এ্যামবুলেন্সে জ্ঞান হবার সময় বলেছে—বিপ্লব। এখানে নমিতার কাছে বলেছে—রুনু। আমার কাছে কিন্তু এইটে বলেছে।

—দেখি।…হুঁ, মুকুল, কেয়ার অফ বকুল, বকুলতলা!

—সে কোথায়?

—জানিনে স্যার।

—হুম! বডি ডিসপোজ করে দাও। লিখে দিচ্ছি।

—পুলিস ভেরিফিকেশন বাকি আছে, স্যার।

—জ্বালাতন! এখুনি ফোন কর তো। বলো, জায়গা নেই। ঘর ভর্তি হয়ে গেছে ডেড বডিতে।…